দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

হঠাৎ
অসহিষ্ণুতার
কথা এল কেন?
— পৃঃ ১৪

এই আঁতাতে
নিহত কংগ্রেসীদের
আত্মা কি বলে
উঠবে না—
বিশ্বাসঘাতক!
বেইমান!
— পৃ : ২৯

৬৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ১৪ মার্চ ২০১৬।। ৩০ ফাল্গুন - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

অসহিষ্ণুতা !

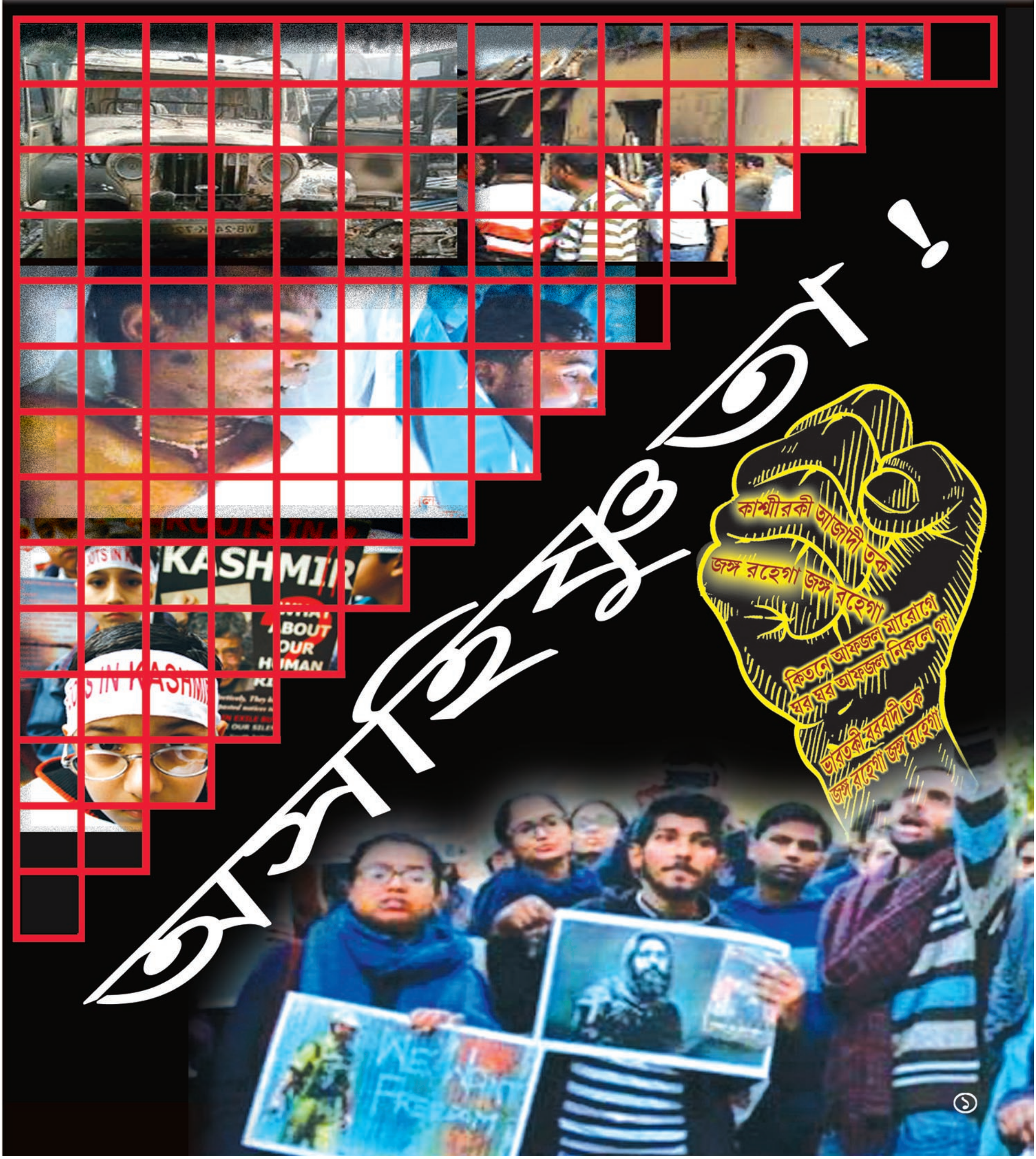

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৪ মার্চ - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

কমরেডরা মনে করছেন তাঁদের ধাপ্পাটা ভোটদাতারা ধরতে পারবেন না ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সরা যখন ধরা হয়, সরণীও ধরণী ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

১৯১৬-১৭ বাজেট : ভবিষ্যতের আশা ও বর্তমানের প্রচেষ্টা ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১২

হঠাৎ অসহিষ্ণুতার কথা এল কেন? ▯ রমানাথ রায় ▯ ১৪

এনডিএ-র বাজেট, ইউ পি এ-র রাজনীতি ▯ এন সি দে ▯ ১৭

জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি ▯ নিরোদ চন্দ্র শর্মা ▯ ২১

শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সীতারামদাস ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

রূঢ় সত্যকে চাপা দিতে তথাকথিত লিবারেল মিডিয়া বাস্তবকে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

এই আঁতাতে নিহত কংগ্রেসীদের আত্মা কি বলে উঠবে না— বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! ▯ অমলকান্তি বসু ▯ ২৯

শনি শিংগনাপুর মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে বিবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে

পশ্চিমবঙ্গে আজ আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যে হিংসার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। এমনকি পুলিশরাও। শাসক দলের মধ্যেও চলছে খুন, সংঘর্ষ। কামদুনি থেকে সীতাই— নারী নির্যাতন অব্যাহত। রাজ্যে আইনের শাসন সঙ্কট নিয়ে লিখেছেন ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর ঘোষ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি এবং ঘরশত্রুরা

দেশ আবার নাশকতার শঙ্কায় শঙ্কিত। ইতিপূর্বে পরিত্যক্ত পাকিস্তানি নৌকো মিলিয়াছিল কচ্ছের উপকূলে, তাহা হইতেই অল্প অল্প করিয়া দানা বাঁধিয়াছিল জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা। অবশেষে সেই আশঙ্কাতেই শঙ্কিত দেশ। কলকাতা বিমানবন্দর উড়াইয়া দেওয়ার হুমকিও মিলিয়াছে। এই জঙ্গিদের পিছনে পাকিস্তানের যেমন মদত রহিয়াছে তেমনি এই দেশেরও যে কিছু মানুষের উৎসাহ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে জঙ্গিরা বুঝিয়াছে ভারতবর্ষে তাহাদের সমর্থন করিবার লোকের অভাব নাই। তাই নতুন উৎসাহে জঙ্গিরা সন্ত্রাস আরম্ভ করিলে অবাক হইবার কিছু নাই। এই দেশে বাক্‌স্বাধীনতার নামে আফজল গুরু, কাসভ প্রভৃতি জঙ্গিদের সমর্থন আসলে সন্ত্রাসবাদীদেরই সমর্থন। বাক্‌স্বাধীনতার আড়ালে দেশবিরোধী শক্তিকে সমর্থনের পরিণতিতেই আবার সন্ত্রাসের আশঙ্কা। ২০০১ সালে দেশের সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত আফজল গুরুর মহিমা প্রচারকারী এবং কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে স্লোগানকারীদের সহিত অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিদের সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা তাহা তদন্ত সাপেক্ষ কিন্তু স্লোগানকারীদের পরোক্ষ সহায়তায় অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। ডেভিড হেডলি যখন ২২/১১ হামলায় পাকিস্তানের যুক্ত থাকিবার প্রসঙ্গে ভারতীয় আদালতে সাক্ষ্য দিতেছে তখন দেশের প্রথমসারির এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি, আফজল গুরুর ছবি লইয়া মহিমা প্রচার—ইহার চেয়ে লজ্জার আর কী হইতে পারে। বাহিরের শত্রুর সহিত লড়া সহজ কিন্তু ভিতরের অচিহ্নিত শত্রু খুবই মারাত্মক। ইহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে ভারত বিরোধী স্লোগান, ভারত শত্রু জঙ্গিকে শহিদ মর্যাদা প্রদানের বিষয়টিকে যাহারা বাক্‌স্বাধীনতার নামে ধামাচাপা দিবার কৌশল করিতেছে তাহাদের সহিত জঙ্গিদের পার্থক্য কোথায়? ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের সময় বামপন্থীরা যেইভাবে দেশকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন আজ রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস একই ভাবে দেশকে বিভ্রান্ত করিতেছে। যাটের দশকের মানসিকতা এখনও বিদ্যমান। বাক্‌স্বাধীনতা লইয়া যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের জানা উচিত ভারতের নাগরিক হইয়া যাঁহারা দেশের বরবাদি চান, তাঁহাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা মোটেও অসঙ্গত হইবে না। কোনো সভ্য দেশ, যেখানে আইনের শাসন রহিয়াছে, সেই দেশে কখনও বাক্‌স্বাধীনতার নামে দেশের শত্রুর মহিমা প্রচার করা হয় না। তাহা হইলে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীদেরও মহিমা প্রচার করিতে হয়। রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদেরও গুণগান করিতে হয়।

যে কংগ্রেস দল স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া গর্ববোধ করিয়া থাকে তাহারই আবার দেশের শত্রুকে কোন নীতিতে সহায়তা করিয়া থাকে তাহা বুদ্ধির অগম্য। লস্কর-ই-তৈবার চার ক্যাডার ইশরাত জাহান, জাভেদ শেখ, আমজাদ আলিরানা এবং জিশান জোহরকে কংগ্রেস দল যেইভাবে সমর্থন করিতেছে তাহাতে প্রশ্ন জাগে কংগ্রেস দলটি কি সত্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিল? আসলে বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করিবার পরপরই যে পরিবার অন্যকে ল্যাং মারিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়াছিল, তাহাদের উত্তরসূরীরা মনে করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের পিতৃপুরুষের জমিদারি। সেখানে অন্য কেহ শাসন করিবে তাহাদের অ-পসন্দ। তাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খলনায়ক বানাইতে দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাইতেও তাহাদের লজ্জাবোধ হয় নাই। এখন তো দেখা যাইতেছে নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করিতে কংগ্রেস লস্কর-ই-তৈবার সাহায্য লইয়াছিল। যখন গুজরাট পুলিশের সহায়তায় সেই কৌশল সফল হইল না তখন মোদীকে রাজনৈতিক ভাবে খতম করিতে ইশরাত জাহান মামলা সাজানো হইয়াছিল। আজ কংগ্রেস দাবি করিতেছে এই ভাবে কোনো সন্ত্রাসীকে খতম করা নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু তাহা হইলে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিখজঙ্গি ভিন্দ্রেয়ালাকে খতম করাও তো নীতিবিরুদ্ধ! কেবল মোদীকে জব্দ করিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা পাকিস্তানি জঙ্গিদের সহায়তা করিতেছে কিনা তাহা আজ চিন্তার বিষয়।

সুভাষিতম্

প্রত্যুত্থানং চ যুদ্ধং চ সংবিভাগং চ বন্ধুষু।
স্বয়মাক্রম্য ভুক্তং চ শিক্ষেচ্চত্বারি কুক্কুটাৎ।।

সঠিক সময়ে জাগা, সদৈব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা, নিজের ভাগ থেকে বন্ধুদের দেওয়া এবং আক্রামক হয়ে ভোজন করা—এই চারটি গুণ মোরগের থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

ইলামবাজারে জেহাদি আক্রমণ

বড় আক্রমণের হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেল হিন্দুরা

বিশেষ প্রতিবেদক॥ ফেসবুক পোস্ট যেন অজুহাত, প্রস্তুতি ছিলই। ২৯ ফেব্রুয়ারি ছিল সোমবার। বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুরিষার এক সদ্যযুবক সুজন মুখার্জী

মুসলিম আক্রমণকারীদের হাতে বিধ্বস্ত ইলামবাজার থানা।

সেদিনই তার ফেসবুক-প্রোফাইল'-এ একটি অশ্লীল বিষয় পোস্ট করে। নবী ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কিত পোস্টটি রুচিহীন অশ্লীল— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হঠাৎ করে ওই যুবকের ফেসবুক পোস্টটি কীভাবে সহস্র মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো? সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা নিশ্চয় মানবেন যে শ্লীল-অশ্লীল মিলিয়ে হাজার হাজার মন্তব্য ও ছবি প্রতিদিন ফেসবুক-ওয়ালে পোস্ট করা হয়। হিন্দুদেবদেবী সম্পর্কে খুঁজলে লক্ষাধিক এরকম 'পোস্ট' দেখা যাবে। কই কেউ তো গুরুত্ব দেয় না। আবার সুজন মুখার্জী নামের ওই কলেজ ছাত্র এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান তার ফেসবুক-পেজ- অনুসরণ করে। সুজনের পোস্টটি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সেটি তার লেখা নয়। সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো স্যোশাল মিডিয়া পেজ থেকে নেওয়া— বাংলা লেখার ধরন থেকেই এটা স্পষ্ট। সূত্র থেকে জানা যায় যে সুজন পুলিশকে জানিয়েছে যে সে নিজে ওই পোস্টটি করেনি, তার অজ্ঞাতসারে তার কোনো বন্ধু বা অন্য কেউ পোস্টটি করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ওই পোস্ট ফেসবুকে করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২৯ সন্ধ্যায় তরুলিয়া, জয়দেব, দুবারাজপুর ও ইলামবাজার থেকে কয়েক হাজার মুসলমান জনতা ঘুরিষা গ্রামে পৌঁছে সুজনের বাড়ি চড়াও হয়। এত দ্রুত কীভাবে এই হাজার হাজার মানুষ সংগঠিত হলো? তবে কি পুরো বিষয়টিই পূর্বপরিকল্পিত ছিল? সহজ সরল গ্রাম্য যুবক সুজনকে ফাঁদে ফেলে কি কোনো বড় চক্রান্ত তৈরি হয়েছিল যাতে দাঙ্গা লাগিয়ে ঘুরিষাকে হিন্দুশূন্য করা যায়? সুজন ও তার বাবা মা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা ভেঙে তছনছ করে দেয় সুজনের বাড়ি, লুটপাট করে নেওয়া হয় সামান্য যা কিছু ছিল। গ্রামের অসহায় হিন্দুরা নীরব দর্শক হয়ে অপেক্ষা করছে কখন পুলিশ আসবে। ভাগ্যক্রমে ইলামবাজার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশকে ঘিরে ধরে উন্মত্ত মুসলমানরা দাবি জানাতে থাকে এখুনি সুজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ওই দিন রাত্রেই গ্রামের এক জায়গা থেকে সুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ইলামবাজার থানায় নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে সুজনের ফেসবুক প্রোফাইলটিও মুছে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েকঘণ্টা ওই আপত্তিকর বিষয়টি ফেসবুকে ছিল, তার জেরে এতবড় বিক্ষোভ কীভাবে সংগঠিত হলো? সুজনদের বাড়ি ভাঙচুর বা লুটপাটের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সময়মতো পুলিশ না পৌঁছলে আরো কত হিন্দুবাড়ি ২৯ রাত্রে লুটপাট হোত কে জানে!

রাতারাতি সুজন গ্রেপ্তার হলো, তবু কেন পরেরদিন আরো বড় অশান্তি!

মুসলমানদের ইচ্ছামতো সুজনদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট হলো, তাদের দাবিমতো ওই রাত্রেই পুলিশ সুজনকে গ্রেপ্তার করলো, ওই রাত্রেই গ্রাম ছেড়ে পালালো সুজনের বাবা-মা। পুলিশ ও গ্রামের হিন্দুরা ওই রাত্রে ভেবেছিল— যাক্ অশান্তি মিটে গেল। কিন্তু পরের দিন সেই ভুল ভাঙলো। পরের দিন ভোর থেকেই সুজনের ছবি দেওয়া অত্যন্ত প্ররোচনামূলক একটি লিফলেট সমস্ত ইলামবাজার এলাকায় ছড়িয়ে মুসলমান জনগণকে ইলামবাজার থানায় সমবেত হওয়ার ডাক দেওয়া হলো। দশটা বাজতে না বাজতেই

কয়েক হাজার মুসলমান জনতার দখলে চলে গেল ইলামবাজার থানা প্রাঙ্গণ, সামনে ৬০ নং জাতীয় সড়ক ও ইলামবাজার বাজার এলাকা। লক-আপে থানার ভিতরে তখন সুজন বাইরে উন্মত্ত জনতার হুঙ্কার— সুজনকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তারাই নাকি ফাঁসি দেবে। থানায় তখন গুটিকয়েক পুলিশ ও দুই আধিকারিক। অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁরা খবর পাঠান ওপরওয়ালাদের। এস ডি পি ও এবং সি আই এসে ভেবেছিলেন বাবা-বাছা করে করে উন্মত্ত মুসলমান জনতাকে শান্ত করবেন। কিন্তু তা হলো না। পরিকল্পনা মাফিক শুরু হয়ে গেল একদিকে থানা-ভাঙচুর, অন্যদিকে জাতীয় সড়কে বাস ভাঙচুর করে যাত্রীদের মারধোর। অসহায়, নিরুপায় পুলিশ তখন লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস দিয়ে উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। আহত হন একাধিক পুলিশ আধিকারিক। পুলিশের এই প্রতিরোধ না হলে সেদিনই হয়তো পুলিশ হেফাজত থেকে ছিনিয়ে হত্যা করা হোত সুজনকে। পুলিশ ভাবলো এখানে বোধহয় মিটল। কিন্তু তা হলো না।

আবার জমায়েত, বড় চক্রান্ত :

থানা থেকে সাময়িকভাবে পালিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দেখা গেল আবার লোক আসতে শুরু হয়েছে। মাইকে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা। মুসলমান জনগণকে এগিয়ে আসার ডাক। ইতিমধ্যে আধাসামরিক বাহিনী-সহ পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায়। পুলিশ ধর-পাকড় করতেই শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। কয়েক ঘণ্টার লড়াই-য়ের পর থানা সংলগ্ন গ্রাম থেকে সেখ সোবাউল নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যায় আবার হাঙ্গামা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুলিশ শক্ত হাতে সেই অপচেষ্টা প্রতিহত করে, মৃতদেহটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

ওইদিন রাত্রেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের একজন সৈয়দ মহম্মদ ইকবাল। এই ইকবাল এক সময় সিপিএম-এর ইলামবাজার জোনাল কমিটির সম্পাদক ছিল। এখন টুপি-দাড়ি রেখে এলাকায় 'ধর্মপ্রাণ মানুষ' হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। পুলিশের ধারণা এই সমস্ত ঘটনার পরিকল্পনার অন্যতম মাথা এই ইকবাল। ১ মার্চে থানা আক্রমণ ও বিকালের হামলায় অসংখ্য বহিরাগত মুসলমান জনতা ও মোল্লা-মৌলভির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পুলিশের ধারণা শুধুমাত্র সংলগ্ন তরুলিয়া, জয়দেব বা দুবরাজপুর নয়, পার্শ্ববর্তী কাঁকসা থানা এলাকা থেকেই এদিন বহিরাগতরা এসেছিল।

ইলামবাজারে স্থানীয় মানুষের পাশে রাজ্য বিজেপির নেতৃবৃন্দ।

কেন পুলিশ সক্রিয় হলো!

আক্রমণের মুখে বিশেষত মুসলমান আক্রমণের মুখে থানা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া যখন একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল ঠিক তখনই ইলামবাজারে পুলিশ ও প্রশাসন খানিকটা হলেও প্রতিরোধে সক্রিয় হয়। ১৬ জনকে গ্রেপ্তার হয়। এখনও নিয়মিত 'রেইড' চলছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

পুলিশের এই সক্রিয়তার একটা বড় কারণ নির্বাচন। গত কয়েক বছরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন-জখমের ঘটনায় শিরোনামে এসেছে বীরভূম। নির্বাচন কমিশনের খুব সুনজরে নেই এই জেলা। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছিল তাতে করে গোটা জেলার এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তো, হিন্দু গ্রামগুলো আক্রান্ত হতে পারতো— তার ফল যে নির্বাচনের মুখে খুব ভাল হোত না তা পুলিশ বুঝতে পেরেছিল। সদাইপুর-দুবরাজপুর-জয়দেব থেকে ইলামবাজার— এই এলাকায় গত কয়েক বছরে মুসলমান মৌলবাদীরা সংগঠিত ও সক্রিয় হচ্ছে। নির্বাচনে তারা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কা আছে। কয়েকদিন আগেই কাঁকসা থানা এলাকা থেকে আই এস আই এস-এর সঙ্গে যুক্ত এক যুবককে এন আই এ গ্রেপ্তার করে। এ বিষয়ে বীরভূম প্রশাসনকেও সতর্ক করা হয়। ২৯ মার্চ, ঘুরিষা গ্রামে ঘটনা সামাল দিতে যান বীরভূম তৃণমূলের কিছু মুসলমান নেতা। কিন্তু মোল্লা-মৌলভিরা তাদের কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ফলে তৃণমূল নেতারা বুঝতে পারেন যে নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে আর নেই। বরং বড় কিছু অঘটন ঘটলে তার ফায়দা পেতে পারে বিরোধীরা, বিশেষত বিজেপি। তাই তাঁরাও চাইলেন পুলিশ সক্রিয় হোক। এসব কিছুর ফলে সাময়িকভাবে হিন্দুরা রক্ষা পেলেন। কিন্তু নির্বাচন মিটে গেলে, কেন্দ্রীয় বাহিনী তুলে নিলে কী হবে— এই আশঙ্কায় আছেন ইলামবাজার-দুবরাজপুরের হিন্দুরা।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রবুদ্ধ সভায় উদ্বেগ

পশ্চিমবঙ্গ কি থাকবে ? আমরা কোথায় থাকব ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ থেকে হুঙ্কার দেওয়া হচ্ছে— 'আমরা ২৭ শতাংশ।' আমরাই হবো সরকারের নিয়ন্ত্রক। এই হুমকি যে অশনি সংকেত সেটাই স্মরণ করিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রবুদ্ধ সভা। গত ৭ মার্চ সন্ধ্যায় কলকাতায় আই সি সি আর সভাগৃহে আয়োজিত এই আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, স্বপন দাশগুপ্ত, মানস ঘোষ ও মানবাধিকারকর্মী ড. মোহিত রায়। 'পশ্চিমবঙ্গের জনক' ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না। দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, উস্তি, মেটিয়াবুরুজ, বেলডাঙ্গা এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কালিয়াচকের উল্লেখ করে ১৯৪৬-এর সময়কার দিনগুলির কথা বক্তারা স্মরণ করিয়ে দেন।

শুধু বাংলাভাষী হলেই নয়, ৫ হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হলে বাঙালি হওয়া যায় না বলে জানান ড. মোহিত রায়। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে নানান পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন— আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ কি থাকবে ? আমরা কি থাকবো ? ইতিবাচক উত্তরের জন্য যথেষ্ট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সুস্থ বহুত্ববাদী সমাজ— এই দুই শর্ত পূরণ একান্ত আবশ্যিক বলে তিনি দাবি করেন।

সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ 'ভদ্রলোকেদের জায়গা' বলে পরিচিত হলেও ১৯৪৭ সালের পর তা যে আর নেই তার প্রমাণ এরাজ্য থেকে তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের বিরুদ্ধে একজনও রুখে দাঁড়ায়নি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য মোহিত রায়-এর প্রস্তাব— রাজ্যের ৮ শতাংশ অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক।

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে মানস ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত, রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও মোহিত রায়।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৫. সম্পাদকের নাম : শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট। **ঠিকানা :** ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :

শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭।
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।
শ্রী অদ্বৈত চরণ দত্ত, ৯-এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা - ৬।
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা - ৪।

আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ১৪.০৩.২০১৬

শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাক নিয়ে মোদী সরকারের সুস্পষ্ট নীতির প্রমাণ মিলল সংসদে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কিছুদিন আগে স্বস্তিকা-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বলেছিলেন এই প্রথম কোনো ভারত সরকার পাকিস্তান নিয়ে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে। তাঁর কথারই প্রতিফলন দেখা গেল গত ২ মার্চ সংসদে। যেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণ রিজিজু সংসদে জানান এই বছর প্রথম ছ'মাসে ৬৫ জন পাকিস্তানি নাগরিককে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানি গায়ক আদনান স্বামীর নাম। ২০১৫ সালেও ২৫৩ জন পাকিস্তানিকে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান ২০১৪ সালে ২৬৭ পাকিস্তানি নাগরিক ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। এছাড়া এই তিন বছরে ৩৫২ জন (২০১৪), ৩৪৪ জন (২০১৫) এবং ৫৫ জন (২০১৬, প্রথম দু' মাসে) অন্য দেশের নাগরিকরা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

অন্য দিকে অন্য একটি পরিসংখ্যানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ওইদিনই সংসদে জানানো হয় আটজন প্রাক্তন সরকারি কর্মীকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভস (পি আই ও)-র হয়ে ভারতের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষেত্রের খবর পাচার করছিল বলে জানানো হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, পাকিস্তান নিয়ে মোদী সরকারে অবস্থান একেবারে সঠিক।

উবাচ

"জঙ্গি হামলার পরে যদি প্রশ্ন করা হয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা না কূটনৈতিক দৌত্য, সরকারের অগ্রাধিকার এখন কোনটা? আমার মনে হয় উত্তরটা খুবই সহজ।"

এস জয়শঙ্কর
বিদেশ সচিব,
ভারত সরকার

দিল্লীতে 'রাইসিনা ডায়লগ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে

"বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করলে যদি রাজ্যের জনগণ উপকৃত হন, তবে আমি তাই করব। জনগণের উন্নয়ন ছাড়া আমার বাবার কাছেও কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রয়োজনে বাবার দেখানো সেই পথে আমিও হাঁটতে তৈরি।"

মেহবুবা মুফতি,
পিডিপি প্রধান

"জে এন ইউ-র ছাত্র নেতা বলেছেন, তাঁর নেতা ও প্রেরণার উৎস হলেন রোহিত ভেমুলা। তখন ভাবলাম, রোহিতও ইয়াকুব মেমনের সমর্থনে সভার আয়োজন করেছিল।"

ভি কে সিং
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বৃন্দাবনে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সম্মেলনে

"আমরা জিতেছি। যারা এক সময় দেশকে ভাগ করার জন্য স্লোগান দিয়েছিল তারা জয় হিন্দ স্লোগান দিচ্ছে। জেল থেকে বের হওয়ার পর তেরঙা পতাকা তুলছে।"

অরুণ জেঠলি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জাতীয় সম্মেলনে।

"আসলে কংগ্রেসের নেতা ও কার্যকর্তারা সব থেকে বেশি সহিষ্ণু। কেননা তাঁরা এখনও রাহুল গান্ধীকে সহ্য করে চলেছেন।"

অনুপম খের
অভিনেতা

কলকাতা দ্য টেলিগ্রাফ আয়োজিত বিতর্ক সভায়।

কমরেডরা মনে করছেন তাঁদের ধাপ্পাটা ভোটদাতারা ধরতে পারবেন না

গূঢ় পুরুষের কলম

কথায় আছে, জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। এবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে রাজ্যবাসীর অবস্থা আক্ষরিকভাবেই এমনটা। বাম গণতান্ত্রিক জোটের অতি সুবিধাবাদী অপশাসনের ভয়। অন্যদিকে, হিটলার দিদির তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধী লুম্পেনদের খুনের রাজনীতি লুঠপাটের রাজত্ব। ভোটদাতারা যাবেন কোথায়? এবার বাঘে কুমিরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মুড়ি মিছরির মতো চলবে বোমা গুলির বৃষ্টি। দিদিতো হুমকি দিয়েই রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীতো তিনদিনের জন্য। ভোটটা হয়ে গেলে চলে যাবে। তারপরে আমাদেরই নিরাপত্তা দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগে বলেছি বদলা নয়, বদল চাই। এবার বলছি প্রয়োজনে বদলা। বাংলাদেশ আর বিহার থেকে যেভাবে প্রচুর বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে তাতে যুযুধান দুই পক্ষই যে বদলার রাজনীতিতে বেশি আগ্রহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নসীম জাইদির কাছে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির সমস্ত তথ্যই আছে। তাই প্রায় একমাস ধরে সাত দফায় এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভোট পর্ব চলবে। কারণ, এছাড়া অন্য দ্বিতীয় পথ ছিল না। প্রতিপক্ষের লাশ ফেলে দেওয়ার ভোটযুদ্ধে রাশ টানা যেত না।

এর আগে, ২০১১-র নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থনে বাংলাজুড়ে ঝড় উঠেছিল। এবার ঝড় দূরের কথা, সমর্থনের সামান্যতম হাওয়াও তৃণমূলের অতি বড় সমর্থক খুঁজে পাচ্ছেন না। বিধানসভার ২৯৪টি আসনেই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকার ঘোষণা কালীঘাটের দিদি সবার আগে করেছেন। তবু দলের কর্মীরা ময়দানে খেলতে নামছে না। উল্টে জেলায় জেলায় প্রার্থী বদলের দাবিতে জোরদার বিক্ষোভ চলছে। লুম্পেনরা তাদের বখরা বুঝে নিতে চাইছে। গত পাঁচ বছর ধরে যে নেতার ছত্রছায়ায় তারা অবাধে তোলাবাজি চালিয়েছে, এখন কালীঘাটের দিদি নেতা বদল করলে তারা ধনেপ্রাণে মারা যাবে। দিদির পছন্দের নেতার আশ্রিত নয়া তোলাবাজরা এলাকা দখল করবে। এই নয়া তোলাবাজরা দাগিদের পিটিয়ে এলাকা ছাড়া করবেই করবে। তৃণমূলের অন্দরের এই ক্ষোভ বিক্ষোভের পরিণতিতে দেখবেন কমপক্ষে সত্তর শতাংশ আসনে দলীয় প্রার্থীকে হারাতে বিক্ষুব্ধরা গোঁজ প্রার্থী দিয়েছে। তৃণমূল দলে কোনোদিনই দলীয় শৃঙ্খলা ছিল না। আজও নেই। দিদির কথাই শেষ কথা। দিদির কথাই দলের সংবিধান। দলের আইন।

আসন রফার নামে সিপিএম-কংগ্রেস নেতারা যেভাবে আকচা আকচি করছেন তাতে জনগণের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে তাঁরা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। আসলে ক্ষমতালোভীদের রাজনীতির চরিত্রটাই এমনি। আজ যে নেতারা আসন রক্ষা নিয়ে যে রকম গরম গরম কথা বলছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে পরস্পরকে জুতোপেটা করবেন। কংগ্রেস এবং তৃণমূল ২০১১ সালে সিপিএমকে হারাতে জোট করেছিল। সেই মধুচন্দ্রিমা বিয়ের ফুল শুখোবার আগেই খতম হয়ে যায়। আসলে সুবিধাবাদী জোটের পরিণতিটাই এমন হয়। বামফ্রন্টের নাম পাল্টে বাম গণতান্ত্রিক জোট বললেই কংগ্রেস সমর্থকরা বিগলিত হবেন এমন ধারণাটার একটাই অর্থ হয়। কমরেডরা মনে করছেন যে তাঁদের ধাপ্পাটা বাংলার ভোটদাতারা ধরতে পারবেন না। কমরেডদের বোঝা উচিত যে ভোটদাতারা ধোপার বাড়ির গাধা নয়। যতখুশি মোট চাপালেও গাধারা বুঝতে পারবে না। বাম গণতান্ত্রিক জোট বলে বাজারে যা চালাতে চাইছেন বিমানবাবুরা আদতে যে তা সিপিএম জোট। আর সিপিএমের ৩৪ বছরের অপশাসন বাংলার মানুষের যে সর্বনাশ করেছে সে কথা এই রাজ্যের মানুষ ভোলেনি।

তৃণমূলের আতঙ্কের রাজনীতি না সিপিএমের বন্ধ্যা দলদাস রাজনীতি এবার সেটাই আমাদের বেছে নিতে হবে। এই বৃত্তের বাইরে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক দল বিজেপি একক শক্তিতে নির্বাচনী লড়াইতে নেমেছে। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক এই দলটির হাতেই এখন সারা দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব বর্তেছে। কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা এখন দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, অসহিষ্ণুতা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচার চালাচ্ছে। আখেরে ক্ষতিটাই তাদের বেশি হচ্ছে। দেশবাসী স্বদেশ প্রেমিক। দেশের স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য মানুষ শহিদ হয়েছেন। মানুষ সেই অমর শহিদদের ভোলেনি। ভুলবে না। তাই কমরেডরা যতই বলুন যে ভারত মুর্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, তাঁদের গণতান্ত্রিক বাক স্বাধীনতা চাই— ততই তারা ঘৃণার পাত্র হবে। বিজেপি ভারতের স্বাদেশিকতার প্রতীক। দলের থেকে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখে থাকে। তাই নির্বাচনে জিততে আদর্শহীন অশুভ জোট গড়ে না। তবে আমরা এই শুভ শক্তিকে বেছে নেব না কেন? প্রশ্নের জবাব আপনার কাছেই আছে। ▌

সরা যখন ধরা হয়, সরনীও ধরনী

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া
দিদি,

প্রাক্ ভোট অভিনন্দন। আপনি এখন খুব ব্যস্ত। আরও ব্যস্ত হবেন। চিঠি পড়ার সময় হবে কি! যাই হোক আপনার কল্যাণে কলকাতা শহর 'ধরণী' পেয়েছে। অফিসে-কলেজে-বাসে-মেট্রোয় মুখে মুখে লি রোডের নতুন নাম। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে কথা পড়তে না পড়তেই বসে গিয়েছে নতুন সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, 'সত্যজিৎ রায় ধরণী'!

১৯৮২ সালেই লি রোডের নাম বদলে ফেলা হয়। পুরসভার নথি থেকে জানা যাচ্ছে, নতুন নাম হয়, 'ও সি গাঙ্গুলি সরণি'! আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড লাগোয়া রাজপথের পুরনো সাইনবোর্ড এখনও আছে। তবে নতুন সাইনবোর্ড বলছে, সরণি এখন 'ধরণী'তে রূপান্তরিত। নাম রাখা নিয়ে আপনার গুণের তো শেষ নেই। মাটি উৎসব, মা উড়ালপুল, বিশ্ব বাংলা রোড, অনেক কিছুই করেছেন। এবার সরণী হলো ধরণী। মেট্রো স্টেশনের নাম আজও বাঙালি মুখস্থ করতে পারল না। বুদ্ধিশুদ্ধি কম তো। কিন্তু এটা যা করলেন দিদি তাতে লোকে সত্যজিৎ রায়কে ভুলে গেলেও রাস্তার নাম ভুলতে পারবে না। ওই রাস্তায় ফাটল দেখা দিলে বলা হবে, ধরণী দ্বিধা হয়েছে।

এর আগে রাস্তার আর এক নাম ডহরকে 'ডহরবাবু' করেছিলেন আপনি। সেটাও ভোলা যাবে না। তবে এবারেরটা মাস্টারস্ট্রোক। আপনি এবার দিদি একটা বই লিখুন। নাম দিন--- 'নামাঞ্জলি'। মুখ্যমন্ত্রী প্রণীত সম্ভাব্য নামের তালিকা-সংবলিত অভিনব বই।

তবে দিদি, আমি বরাবরই আপনার সমর্থক। অন্ধ সমর্থক। তাই আপনার সবই আমার ভাল লাগে। সেই হিসেবেই বলছি, আপনিই সরণীকে ধরণী বানাতে পারেন। কারণ, ক্ষমতার ব্যবহার করে সরাকে যে ধরা জ্ঞান করা যায় সেটা আপনার থেকে ভাল কেউ জানে না। কেউ আগামি দিনেও এমন করে দেখাতে পারবে না।

আপনি এগিয়ে দিদি। আপনি এগিয়ে। ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণাতেও দেখলাম আপনি সবার থেকে আলাদা। জুম্মাবারে তালিকা প্রকাশ, জুম্মাবারে দলের ইস্তাহার প্রকাশ, জুম্মাবারে প্রচার শুরু। সরকার গড়লে জুম্মাবারেই শপথ। দেখালেন বটে। আরে সেই গান আছে না, জুম্মা চুম্মা দে দে দে...। এখানে অবশ্য চুম্মা মানে ভোট।

আপনি কি একটু বামপন্থী হয়েছেন! নিজেই অবশ্য সেকথা বলেওছেন। তবে আচরণে কিন্তু আপনি বুদ্ধবাবুদের উপর দিয়ে যাচ্ছেন।

সেদিন গোটা দেশ দেখেছে দিদি। নয়াদিল্লীতে নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক সম্মেলন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যে সব রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন তার দিনক্ষণ ঘোষণা হলো। তার পরে কয়েক মিনিটের বিরতি। গোটা দেশে একমাত্র একটি দল সব আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল। দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একেবারে এমন ছবি না হলেও, একযোগে সমস্ত কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতে দেখেছে এই বাংলা। তবে সেটা বরাবর করে এসেছে ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সিপিএম রাজ্য দপ্তর থেকে গোটা তালিকা হাতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন অনিল বিশ্বাস, বিমান বসুরা। সেই ধারা আর বজায় থাকল না সূর্যকান্ত মিশ্র জমানায়।

এবার সেই দৃশ্যই দেখাল কালীঘাট। দলনেত্রীর বাড়িতে। বিরোধী দলেরা যখন জোট নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় তখন শাসকদল একদিনে সব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল। নিঃসন্দেহে এটা এক কদম এগিয়ে থাকা দিদি। কংগ্রেস সিপিএম এখনও জোট হবে কি হবে না, তা নিয়ে দোলাচলে। গত বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তৃণমূল কংগ্রেস যখন জোট সঙ্গীর সঙ্গে দর কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে তখন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে এগিয়ে যেত বামফ্রন্ট। এবার ভোটের ফলাফল কী হবে তার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে ফার্স্ট রাউন্ড এগিয়ে রইল দিদি আপনার ঘাসফুল। এমনভাবে একদিনে বিধানসভা ভোটের গোটা প্রার্থী তালিকা প্রকাশের নজির তৃণমূল কংগ্রেসেও নেই। বিরোধী দলনেত্রী যেটা পারেননি সেটাই করে দেখালেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা। একেবারে 'বামপন্থী' কায়দায়। ক্ষমতায় এসে সত্যিই 'বদল'।

দিদি এবার জিতলে বাংলার নামটা বদলাবেন প্লিজ। আমাদের ভাষার নামটাও। কেমন যেন মদ মদ গন্ধ।

— **সুন্দর মৌলিক**

১৯১৬-১৭ বাজেট

ভবিষ্যতের আশা ও বর্তমানের প্রচেষ্টা

অম্লানকুসুম ঘোষ

মহাকালের অনন্ত চলার পথে স্রোতস্বিনী পার্শ্বস্থ তটভূমিসঙ্কুল পরিস্থিতি- বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি আমরা মানবজাতি। সেই বৈচিত্রসমূহ কখনও রাজনীতিক্ষেত্রে, কখনও সামাজিকক্ষেত্রে, কখনও অর্থনীতি ক্ষেত্রে, কখনও বা সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেইরকমই এক বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে। অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে এবারের বাজেট শুধুমাত্র বার্ষিক হিসাব নিকাশে আবদ্ধ ছিল না, হয়ে উঠেছিল সরকারের জিয়নমরণ কাঠি। সেইসঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিরও। সেই পরিস্থিতির উদ্ভব এবং বাজেটের দ্বারা সেই পরিস্থিতির মোকাবিলাকে বিশ্লেষণ করা যাক।

গত কয়েকমাস ধরে ভারতীয় অর্থনীতির রথের চাকা সঠিক পথে ঘুরছিল না। নতুন সরকার আসার পরে এক বছর ধরে অর্থনীতির ক্রীড়াক্ষেত্রে যে উন্নতির সোপানশ্রেণীর খোঁজ পেয়েছিল ভারতীয় অর্থনীতি তা হস্তচ্যুত করে হঠাৎই যেন পতনের সাপের মুখে পড়েছিল ভারতীয় অর্থনীতি। লাগামছাড়া বাড়তে থাকা শেয়ার সূচক হঠাৎই যেন চোরাবালির গ্রাসে হয়েছিল পাতালমুখী। জিডিপি গ্রোথ রেট নতুন হিসেবের দৌলতে ঊর্ধ্বমুখী হলেও তাতেও ছিল পতনের আশঙ্কা। পাশাপাশি রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের হুঙ্কার, বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভায় পরাজয় এবং ছাত্রসমাজের পথভ্রষ্ট এক অংশের বিদেশি চক্রান্তের শরিক হয়ে দেশদ্রোহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং অমর্ত্য সেন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর তাতে সামিল হওয়া, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি রীতিমতো সঙ্কটজনক ছিল। এর মধ্যে বার্ষিক বাজেট পেশ করার বিষয়গুলিও ছিল বিপরীতমুখী। সরকার নানা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় আয়-এর ঘাটতি ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার আশঙ্কা এবং আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি কমার কারণে বাণিজ্যিক ঘাটতি বৃদ্ধির আশঙ্কা এবং জনকল্যাণ খাতে সরকারি ব্যয় না কমানোর দায়, সবই ছিল একসঙ্গে। এই বাধাসমূহকে দূর করতে কী পদক্ষেপ করলেন অর্থমন্ত্রী, বাজেটও বা কেমন হলো, একটু পর্যালোচনায় আসা যাক।

> এবারের বাজেট এক বছরে আবদ্ধ না থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে সুদূরে। ফল কী হয় তা হয়তো বলবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমানের প্রচেষ্টা কম আশাপ্রদ নয়।

বাজেটের দুটি দিক থাকে। এক সরকারের আয়ের দিক, দুই সরকারের ব্যয়ের দিক। সরকার আয় বাড়াতে এবার বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমত, বার্ষিক আয় ১ কোটির বেশি হলে সারচার্জ ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। সরকারের আয় কিছুটা বাড়বে, সঠিক পদ্ধতিতেই বাড়বে। কিন্তু বৃদ্ধির পরিমাণ এত কম কেন? এর ফলে কোনো ব্যক্তি যাঁর বার্ষিক আয় ২ কোটি টাকা তাঁর ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়লো মাত্র ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৯০০ টাকা (আগে ছিল ৬১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, এখন ৬২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা)। তাঁর বিপুল পরিমাণ আয়ের তুলনায় এটুকু কর বৃদ্ধি কিছুই নয়, সারচার্জের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারতো কিংবা অন্য কোনো স্তর সৃষ্টি করে (বার্ষিক ১০ কোটি বা ১০০ কোটি) তার ওপর করের নতুন ধারা বসানো (সারচার্জ নয়) যেমন ৪০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ আয়কর চালু করা যেতে পারতো। সরকারের আয় তাতে আরও অনেক বেশি বাড়তো। দ্বিতীয়, দেশি সংস্থার ডিভিডেন্ট বছরে ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে বাড়তি দশ শতাংশ

কর বসানো হয়েছে, এই পদক্ষেপও সময়োপযোগী। তৃতীয়ত, দশ লক্ষ টাকার বেশি দামের গাড়ি ও দুই লক্ষ টাকার বেশি পণ্য বা পরিষেবা নিলে উৎসে ১ শতাংশ কর বাড়তি ধার্য করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ শুধু অর্থনীতির পরিভাষাতেই নয়, সামাজিক ন্যায়ের মাপকাঠিতেও প্রশংসনীয়। সরকারের আয় বৃদ্ধির আরেকটি দিক হলো বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের ওপর কর বসানো বা ছাড় দেওয়া। সেক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়ের দিকে নজর দিয়েছে সরকার।

যেমন সিগারেট কর বৃদ্ধি করে সরকারি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক স্বাক্ষরের দিকটিও নজরে রাখবে। ঠাণ্ডা পানীয়, দামী পোষাক, বিমানের জ্বালানি ইত্যাদির দাম বৃদ্ধিও একই ভাবে দু'রকম উদ্দেশ্যসাধক। সোনার ওপর কর বাড়ানো সরকারি আয় বাড়ানো ছাড়াও অর্থনৈতিক আরেকটি সমস্যার সমাধান করতে পারে। বর্ধিত দামের সোনা কেনা থেকে যদি দেশবাসী বিরত থাকে তাহলে সোনা আমদানি কমে (যা আমদানীক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামের পরেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম) ফলে সরকারি আয়-ব্যয় ঘাটতি কমানো ছাড়াও বাণিজ্যিক ঘাটতি কমানোর কাজেও এই পদক্ষেপ সহায়ক হবে।

শুধু অবশ্য সরকারি হিসেবসমূহ (Fiscal deficit & current A/C deficit)-কে নিয়ন্ত্রণে রাখাই বাজেটের লক্ষ্য হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে উৎসাহদান ও জনকল্যাণ-ই বাজেটের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে এবার কম দামি ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার গৃহ-ঋণকারীদের করছাড়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে যা নিঃসন্দেহে গৃহনির্মাণ শিল্প (সঙ্গে যুক্ত অগণিত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক) ও ইস্পাত, সিমেন্ট ও নানা শিল্পকে সাহায্য করবে। পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্কিং শিল্পও এতে লাভবান হবে। ব্রেইল পেপার ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহৃত নানা সরঞ্জামে কর ছাড় সুবিধা দেবে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের শিক্ষায়। যা মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় ত্রিবিধ লক্ষ্যেই উন্নয়নকামী। আবার সৌর বিদ্যুতে ছাড়, হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়িতে ছাড় ও দূষণহীন স্টোভ ও উনুনে ছাড় এগুলি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিবেশবান্ধব সমাজ ও অর্থনীতিব্যবস্থা তৈরির সহায়ক হবে। ডায়ালিসিসের যন্ত্র সস্তা করা ও গ্রামে গ্রামে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ উন্নত চিকিৎসা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার এবং এটিও একইসঙ্গে ত্রিবিধ সুবিধা (মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়) প্রদান সহায়ক হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা পরিকাঠামো উন্নয়নে বাড়তি ব্যয় ও শিক্ষাক্ষেত্রের ডিজিটালাইজেশন (যথা ই-সার্টিফিকেট প্রদান) শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে উপরোক্ত ত্রিবিধ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেবে।

বাজেটের ব্যয়ের দুটি দিক থাকে, এক, পরিকাঠামো উন্নয়ন, দুই পরিকাঠামো বহির্ভূত ভরতুকি জাতীয় ব্যয়। পরিকাঠামো উন্নয়নে এবছর সরকার দরাজ হস্ত রেল ও সড়ক পথ বা পরিকাঠামোর সবচেয়ে বড় দুটি ঘাঁটি, তার উন্নয়নে বাড়তি ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা। আর দেশের বন্ধ হয়ে থাকা ১৬০ নং বিমানবন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০ থেকে ১৬০ কোটি টাকা করে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে যাতে সেগুলি খুলতে পারে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এই বিপুল ব্যয় দেশের অর্থনৈতিক যাত্রাপথকে মসৃণ করে তুলবে বলেই আশা করা যায়। আবার পরিকাঠামো বহির্ভূত ভরতুকিজাতীয় ব্যয়েও সরকার কার্পণ্য করেনি। গ্রামীণ উন্নয়নে এবছর বরাদ্দ হয়েছে ৮৭৭৬৫ কোটি টাকা। 'মহাত্মা গান্ধী নারেগা'-তে ৩৮৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এছাড়া কৃষি ও কৃষক কল্যাণে ৩৫৯৮৪ কোটি টাকা, ২৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা। কৃষিঋণ সুদ কমাতে ১৫ হাজার কোটির বাড়তি বরাদ্দ। তিন বছরে ছ' কোটি পরিবারকে গ্রামীণ ডিজিটাল প্রশিক্ষণ দেওয়ার ঘোষণা। ২০১৮-র ১ মে-র মধ্যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ, পরিবার পিছু বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা (প্রবীণ হলে বাড়তি ৩০ হাজার)। গ্রামের উন্নতিতে সরকার দরাজহস্ত হয়ে ভারতের গরিষ্ঠ অংশের (মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ) উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব কৃষিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য দেশে দশ লক্ষ জৈব সার প্রস্তুতকারক চৌবাচ্চা নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যা পরিবেশ, কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতি এবং জনস্বাস্থ্য সব দিক থেকেই দেশের মঙ্গলকারী।

বাজেট বার্ষিক ব্যাপার। কিন্তু এবারের বাজেট এক বছরে আবদ্ধ না থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে সুদূরে। ফল কী হয় তা হয়তো বলবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমানের প্রচেষ্টা কম আশাপ্রদ নয়।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের চিকিৎসক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ২০শে মার্চ ২০১৬ রবিবার, সকাল ৮-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত কেশব ভবনে, (৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৬, মাণিকতলা, কলকাতা-০৬) বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

শুভেচ্ছাসহ—

ডাঃ সুকুমার মণ্ডল

সভাপতি

প্রতিনিধি শুল্ক ৩০০্ টাকা

ডাঃ পি. কুণ্ডু, **Mob : 98314 91658**

ডাঃ এন. অধিকারী, **Mob : 98317 10788**

হঠাৎ অসহিষ্ণুতার কথা এল কেন?

রমানাথ রায়

ভারতবর্ষের বুকে এক শ্রেণীর মুসলমানদের অস্তিত্ব দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এক সময় তারা ছিল হিন্দু। তারপর হলো মুসলমান। মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের সাজপোশাক মুখশ্রী শুধু বদলাল না, আচার-আচরণ খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত বদলে ফেলল। একদিন যাদের পিতৃপুরুষদের কাছে গো-মাংস নিষিদ্ধ বস্তু ছিল, সেটাই এখন তাদের কাছে সুখাদ্য হয়ে উঠল। হিন্দুনাম পরিত্যাগ করে আরবি নাম গ্রহণ করল। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ, যে-কেউ যে-কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। আচার-আচরণ বদলাতে পারে। নিজের চেহারাটাও বিকৃত করতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলে না। করতে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভারতে বাস করে অভারতীয় মন নিয়ে বেড়ে ওঠা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে। ভারতের বুকে জন্ম নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঘাত করা আগুন নিয়ে খেলা করার মতো। অথচ সেই খেলাটাই তারা করে যাচ্ছে। করতে করতে তারা ভারতের বুকে বিচ্ছিন্ন একটা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, যাদের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির কোনো যোগ নেই। ফলে তারা মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মান্ধতা, হিংস্রতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে সারা ইউরোপে যখন মুসলমান শরণার্থীর দল নেমেছিল, তখন সেখানকার মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেই আতঙ্ক এখনও তাদের মধ্যে তীব্র আকারে বর্তমান। সেই সময় জার্মান টিভি-চ্যানেলে এক মহিলার সাক্ষাৎকার শুনেছিলাম। এক মুসলমান সাংবাদিক সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুসলমানদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? উত্তরে মহিলা বলেছিলেন, আমি মুসলমানদের সম্পর্কে আতঙ্কিত। সাংবাদিক এর কারণ জানতে চেয়েছিলেন। মহিলা তখন বলেছিলেন, মুসলমানরা মসজিদে নামাজ পড়েই ছুরি হাতে নিয়ে মানুষ খুন করতে বেরিয়ে পড়ে। সাংবাদিক তখন হেসে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি মুসলমান। আমাকে দেখে কি আপনার তাই মনে হচ্ছে? মহিলাও হেসে বলেছিলেন, না। কারণ তুমি জার্মান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছ। তাই বলি, যে দেশের মধ্যে আমি বাস করছি, সেই দেশবাসীর সঙ্গে শুধু নয়, সেই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়াটাই বড় কথা। মিশে গেলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিল আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে। তাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় বিভেদ ছিল। কিন্তু সেই বিভেদ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণে আমাদের বিমুখ করেনি। তারাও আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মিলন সম্ভব হয়েছিল। আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছি, কিন্তু কিটস, শেলি, বায়রন, স্কট আনন্দের সঙ্গে পাঠ করেছি। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা হয়নি। তারা কোনো উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে এদেশে আসেনি। তারা এসেছিল তরবারি আর কোরান নিয়ে। তারা পদে পদে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে অপমান করেছে। তারা শুধু ধ্বংস করেছে, দেয়নি কিছুই। অবশ্য যাদের কোনো সভ্যতা নেই, সংস্কৃতি নেই, তারা দেবেই বা কী! অবশ্য প্রাক্-ইসলামিক যুগে মধ্যপ্রাচ্যে একটা উন্নত সভ্যতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রসারের ফলে সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই ধ্বংসের কাজ আজও অব্যাহত। নইলে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে তারা হাতুড়ি দিয়ে, বোমা দিয়ে, মেশিনগান দিয়ে কেন ধ্বংস করতে চাইবে?

ক্যানিং, দেগঙ্গা, পাচলা, উস্থি প্রভৃতি জায়গায় মুসলমানরা দাঙ্গা বাধিয়েছিল। ধর্ষণ থেকে শুরু করে সবরকমের কুকর্ম তারা এইসব জায়গায় করেছিল। তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। তখন কিন্তু কেউ মুসলমানদের হিংস্রতা ও অসহিষ্ণুতার কথা বলেনি।

আমাদের দেশের মুসলমানরা আজও সেই ধ্বংসাত্মক মানসিকতায় আক্রান্ত। অবশ্যই সব মুসলমান জঙ্গি নয়, কিন্তু সব জঙ্গিই মুসলমান এবং যারা জঙ্গি নয়, তারা মনে মনে এই জঙ্গি কার্যকলাপকে সমর্থন করে। না হলে এই জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কেন সোচ্চার হয় না? কেন মিছিল বের করে না? কেন সব জেনে শুনে চুপ করে থাকে? কেন এই জঙ্গিদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়? আমাদের সরকারও এদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় না। সরকার বিরোধীরাও এদের সম্পর্কে নীরব থাকে। কিংবা যা বলে তা নীরব থাকারই সামিল।

কেন? কেন এই নীরবতা? কেন এই তোষণ? কারণ ভোটব্যাঙ্ক। এক সময় ভোটব্যাঙ্ক ছিল না। কিন্তু তখনও ছিল মুসলমান তোষণ। এই তোষণ নীতির সূত্রপাত করেছিলেন গান্ধী। স্বাধীনতার আন্দোলনে মুসলমানদের তেমন ভূমিকা ছিল না। কারণ তারা স্বাধীনতার আন্দোলনে যুক্ত হতে চায়নি। আমরা তাই তাদের বাদ দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে এল কী এল না, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা ছিল না।

আমরা জানতাম দেশটা আমাদের। আমাদেরই কর্তব্য দেশটাকে স্বাধীন করা। কিন্তু গান্ধীর হঠাৎ কেন জানিনা এই সময় মুসলমানদের কথা মনে পড়ল। তিনি মুসলমানদের মন পাওয়ার জন্যে খিলাফত আন্দোলন শুরু করলেন। ফল শূন্য। গান্ধীর এ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দমেননি। বন্ধ করেননি মুসলমান তোষণ। নির্লজ্জ এই তোষণের পরিণাম দেশভাগ। মুসলমানরা এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। কিন্তু তারাই ভারতের দু'পাশ থেকে দু'টো অংশ নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তাতেও রেহাই নেই। নেহরুঃ মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক করে এদেশে রেখেছিলেন। মুসলমানদের প্রতি দরদ শুধু নেহরুর মধ্যে ছিল না, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ছিল। থাকারই কথা। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান ছিল। তাই ১৯৪২ সালে ৮ আগস্ট পিপলস্ ওয়ার-এ লেখা হলো : Behind the demand for Pakistan, there is justified desire of the people of Muslim nationalists. কমিউনিস্টদের এই মুসলমান তোষণ এখানেই থেমে থাকেনি। তারা জানে দেশভাগের পর মুসলমানদের সমর্থন ভোট-রাজনীতিতে দরকার হতে পারে। হয়েওছিল। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগের সমর্থনে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসু ভোটে জিতেছিলেন। আর ১৯৬৭ সালে নাম্বুদ্রিপাদ মুসলিম লিগকে জোটসঙ্গী করেছিলেন। জাতির স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রবল ছিল। এই কারণেই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি আজ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এরিক হবসবম ঠিকই বলেছেন : Private and selfish interests have seriously eroded Left-Wing values, সূত্র : What is left of left. (The new century).

আজও কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা অতীতের শিক্ষা নিয়ে তাদের ভুল সংশোধন করেনি। তারা আজও মুসলমান তোষণ করে চলেছে। কিছুদিন আগে বিহারে বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস খুঁজে বেড়াচ্ছিল এমন একটি বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কংগ্রেসের কপাল খুলে গেল। দাদরিতে গোরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে এক মুসলমানকে পিটিয়ে মারা হলো। সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে দামামা বেজে উঠল। 'গেল গেল' রব উঠল। খবরের কাগজ, টিভিতে ঘটনাটা নিয়ে এমন চেঁচামেচি শুধু করল যেন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। চতুর্দিকে রব উঠল, আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা সহিষ্ণু নই। আমরা অসহিষ্ণু। এই তথ্য কংগ্রেস ও বামপন্থীরা কোত্থেকে পেল তা জানি না। টিভির লোকেদেরই বা এই তথ্য কারা জোগাল? যারাই যোগাক তারা সফলই হয়েছিল। নইলে কংগ্রেস ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা দলে দলে পুরস্কার ফেরত দিতে যাবে কেন?

> **আজ বলছে গণতন্ত্র বিপন্ন। জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেসের কি একথা মনে ছিল না, মনে ছিল না শিখদের ব্যাপক হারে হত্যা করার সময়? তখন তো কেউ অসহিষ্ণুতার কথা বলেনি। এখন তারা অসহিষ্ণুতার কথা বলছে। কাদের লক্ষ্য করে বলছে এসব কথা? বলছে হিন্দুদের উদ্দেশে। মুসলমানদের উদ্দেশে তারা একটা কথাও বলে না।**

সমস্যা হলো, যাদের কাছে এই পুরস্কার ফেরত দিল, তারা কিন্তু এদের কাউকেও পুরস্কার দেয়নি। না দিলেও উদ্দেশ্য ছিল একটা সরকার-বিরোধী হৈচৈ বাধানো। হ্যাঁ, বাধিয়েও ছিল। বিহারের নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ল। বিহারের মুসলমানরা ভাবল, কংগ্রেস এবং লালু-নীতীশরা তাদের প্রকৃত বন্ধু। তারা হাত খুলে ভোট দিয়ে এদের ক্ষমতায় আনল। তারপর? শুরু হলো পুরস্কার ফেরত নেওয়ার পালা। বুদ্ধিজীবীরা যে-সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, তারাই আবার সেই সরকারের পায়ে পড়ে গেল। বলতে লাগল, ওগো সরকার, যা হবার হয়ে গেছে। এবার অনুগ্রহ করে আমাদের পুরস্কার ফিরিয়ে দাও। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কতখানি অসৎ এবং ঘৃণ্য হতে পারে তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মজার ব্যাপার যে মুসলমানটিকে হত্যা করা হয়েছে সে যদি মুসলমান না হয়ে হিন্দু হোত এবং হত্যাকারীরা হোত মুসলমান, তাহলে কেউ টুঁ শব্দ করত না। অসহিষ্ণুতার প্রশ্নও উঠত না। কোনোদিন ওঠেওনি। কালিয়াচকে এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ সেই খবর চারদিন ধরে কোনো কাগজে ছাপা হলো না, কোনো চ্যানেলেও তার খবর প্রকাশ করা হলো না। শুধু 'যুগশঙ্খ'-এ এই মর্মান্তিক হামলার খবর ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছিল। তারপর সর্বভারতীয় খবরের কাগজে এবং নানা টিভি চ্যানেল যখন ফোটো-সহ খবর প্রকাশিত হলো, তখন আমাদের মিডিয়ার টনক নড়ল। বুঝল এটা অন্যায় হয়েছে। সরকার তো ভোটের স্বার্থে এ খবর চেপে যাবে, তা জানা ছিল। কিন্তু মিডিয়াগুলো ঘুমিয়ে রইল কেন? কেন আর হুক্কাহুয়া রব শোনা গেল না। অথচ লক্ষাধিক মুসলমান মিলিত হয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালাল, মন্দির ভাঙল, থানা পুড়িয়ে দিল। এছাড়া এগারোটি গাড়ি তারা পোড়াল। শুধু

তাই নয়, পাশের হিন্দুগ্রাম ব্যালিয়াপাঙ্গায় তাণ্ডব চালাল। দু'জন মানুষ গুলিবিদ্ধ হলো। অথচ এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখলাম না। পুরস্কার ফেরত দিতে দেখলাম না। দেখলাম না কংগ্রেস বা বামপন্থীদের কোনো মিছিল। এছাড়া আগে ক্যানিং, দেগঙ্গা, পাচলা, উস্থি প্রভৃতি জায়গায় মুসলমানরা দাঙ্গা বাধিয়েছিল। এই মুসলমানদের কোনো শাস্তি হয়নি। অথচ ধর্ষণ থেকে শুরু করে সবরকমের কুকর্ম তারা এইসব জায়গায় করেছিল। তখন কিন্তু কেউ মুসলমানদের হিংস্রতা ও অসহিষ্ণুতার কথা বলেনি। কী করে বলবে? তারা যে মুসলমান । তারা যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মূল্যবান ভোটব্যাঙ্ক। এদের কি চটানো চলে? এদের ভোটেই যে নেতারা ক্ষমতায় আসে। আর, এইভাবেই মুসলমানরা ভারতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একথা মুসলমানরাও জানে। জানে বলেই একজন দর্পভরে বলে, আমরা সাতাশ পারসেন্ট। আমরাই বামপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করেছি। আমরা ইচ্ছে করলে বর্তমান সরকারকেও ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি। কিছুদিন আগে এই লোকটি বলেছিল, আমরা মুসলমানরাই দেশ স্বাধীন করেছি। মূর্খতার সঙ্গে ঔদ্ধত্যের মিশ্রণ ঘটলে এইরকম জীব তৈরি হয়।

এইসব লোকদের এরকম ঔদ্ধত্য প্রকাশের সাহস দিল কারা? দিয়েছে ক্ষমতালোভী কংগ্রেস এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রদ্রোহী বাম নেতারা। কংগ্রেস যেমন একদিকে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, তেমন আমাদের ঘর শত্রু বামপন্থীরা শুধু পাকিস্তান ও বাংলাদেশিদের মদত দেয়নি, তাদের পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও ঘটিয়েছে। এই কারণে বামপন্থীদের দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয়। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধিক্কার জানিয়ে রাশিয়ার জয়গান গেয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় চীনা ফৌজকে বলেছে মুক্তিফৌজ। তারা তখন বলেছে চীন ভারত আক্রমণ করেনি, ভারতই চীন আক্রমণ করেছে। এদেরই বংশধর রোহিত ভেমুলা। সে বিবেকানন্দকে ফেসবুকে কুৎসিত ভাষায় শুধু আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, পাশাপাশি আফজল গুরুর মতো নৃশংস হত্যাকারীর ফাঁসির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছে। এই দেশদ্রোহী বামপন্থীরা সম্প্রতি জে এন ইউ-তে আফজল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে চেঁচামেচি করছে। যেভাবেই হোক এদের ধ্বংস করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, এই দেশবিরোধী মানসিকতার মূল উৎপাটন করা অত্যন্ত জরুরি। আজ কংগ্রেস ও বামপন্থীরা মিলিত হয়ে চিৎকার করছে— মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তারা বলছে, গণতন্ত্র বিপন্ন। জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেসের কি একথা মনে ছিল না, মনে ছিল না শিখদের ব্যাপক হারে হত্যা করার সময়? তখন তো কেউ অসহিষ্ণুতার কথা বলেনি। আবার বামপন্থীরা যখন নকশালদের ধরে নির্মমভাবে পেটাল, তাদের হাত-পা ভেঙে দিল তখন কি গণতন্ত্র বিপন্ন হয়নি? তখন কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়নি? এখন তারা অসহিষ্ণুতার কথা বলছে। কাদের লক্ষ্য করে বলছে এসব কথা? বলছে হিন্দুদের উদ্দেশে। মুসলমানদের উদ্দেশে তারা একটা কথাও বলে না। তারা মুসলমানদের মহল্লায় গিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে না। তাদের বলে না, তোমরা ধর্মান্ধ হয়ো না, সাম্প্রদায়িক হয়ো না। বলে না, তোমরা ধর্মনিরপেক্ষ হও। না বলে তারা মৌলবিদের কাছে গিয়ে ভোটভিক্ষা করে, তাদের নানাভাবে তোয়াজ করে। তাদের আরও ধর্মান্ধ করে তোলে। গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা করে তাদের আরও গোঁড়া, আরও বেশি মুসলমান করে তোলে। কারণ তারা ভোটব্যাঙ্ক। নেতারা জানে মুসলমানদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্য নেই। মুসলমানরা মুসলমান হয়ে জন্মায়, মুসলমান হয়ে বেড়ে ওঠে, মুসলমান হয়ে মরে। প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার কোনো স্বপ্ন তারা দেখে না। আমরা হিন্দুরা অত্যন্ত সহিষ্ণু বলেই এদের সহ্য করেছি। অথচ এই মুসলমানদের তোয়াজ করার জন্যে দাদরি কাণ্ড নিয়ে হৈচৈ। অসহিষ্ণুতার ঝড় তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার আপ্রাণ চেষ্টা। রাজনীতির জগৎ থেকে যারা মুছে যেতে বসেছে তারা আবার মুসলমানদের ধরে বেঁচে উঠতে চাইছে। বেঁচে ওঠা আর হয়ত সম্ভব নয়। হয়ত একদিন সত্যি মুছে যাবে। কিন্তু তাদের কলঙ্কিত ইতিহাস মুছবে না। ভারতবাসী আজ সবই বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে যাদবপুর, হায়দরাবাদ, জে এন ইউ-তে সন্ত্রাসবাদীদের টাকা খাটছে। গ্রামেগঞ্জেও একই ঘটনা ঘটছে। ■

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯
সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

এনডিএ-র বাজেট, ইউপিএ-র রাজনীতি

এন সি দে

ভারতীয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে নবীনই বলা যায়। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়ে যে পরিপক্বতা আসা উচিত ছিল তার কিঞ্চিত মাত্রও এখনও পর্যন্ত অর্জিত হয়নি। এর মুখ্য কারণ, আমার মতে, জাতীয় দায়-দায়িত্ববোধের অভাব। এর উৎস অবশ্যই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস। ঐতিহাসিক প্রয়াত রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এই জাতীয়তাবোধ মধ্যযুগে তো অজানা ছিলই, প্রাচীন ভারতেও তা ছিল সমস্যা জর্জরিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই জাতীয়তাবোধের অভাব ছিলই। দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই এদেশের জাতীয় মেরুদণ্ড ধ্বংসকারী মেকলের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন।

ধান ভানতে শিবের গীতের মতো বাজেট বিশ্লেষণে এই গীতটুকু গাইতেই হলো। কারণ বর্তমান ভারতীয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রাধান্যই অধিক হওয়ায়, শাসন ব্যবস্থা প্রায় অধরাই থেকে যায়, এটুকু সকলেই মানবেন বোধ হয়। শাসন করতে গেলেই যেখানে অপশাসনের অপবাদ বইতে হয়, সেখানে সব দলই ন্যায়-শাসন করার চেয়ে রাজনীতি করাটাকেই শ্রেয় মনে করে। মরুক গে যাক্ দেশ, দেশের শিল্প ইত্যাদি। এর ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদমাধ্যম আজ সংসদীয় রাজনীতি বলে উল্লেখ করে থাকে। এই রাজনীতির প্রতিফলন আমরা দেখে থাকি সংসদে সব আমলেই। গত বারের সংসদীয় গণতন্ত্রের পূজারি, এবারে সংসদে অনৈতিকভাবে জোট বেঁধে সংসদীয় ব্যবস্থাকে অচল করার কাণ্ডারি।

এমনটা কিন্তু সত্য নয় যে আগের সরকারের সঙ্গে এই সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাত। জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতিকে পঙ্গু করার লক্ষ্যে ভারতীয় শিল্পে ক্রমাগত বিদেশি পুঁজির বিকাশকে সাহায্য করতে সব দলের সরকারই বদ্ধপরিকর। ভারতীয় শিল্পকে সহজেই বিদেশি অধিগ্রহণ সহজ করতে ইউপিএ সরকার কোম্পানি আইন বদল করেছে। এনডিএ সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে বিদেশি শিল্প শাসনকে সাবলীল করতে শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত। ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদকে সন্তুষ্ট করতে কর্পোরেট প্রীতিতে উভয়ই সমান পারদর্শী।

এদেশের দল ও সরকারের মতো এদেশের গণ-মাধ্যমগুলিও কর্পোরেট-বন্ধু। বৃহৎ মিডিয়া হাউসগুলি তো নিজেরাই কর্পোরেট হাউস। এরা কর্পোরেট হাউসগুলির বন্ধু দল বা জোটকে রাজা বানানোর কাজেই সদা লিপ্ত। তাই এইসব প্রচার মাধ্যমগুলি সদাই ব্যস্ত কর্পোরেট লবির স্বার্থে চালিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নে। এই তথাকথিত 'সংস্কার-কর্মসূচি' পালন করতে গিয়ে জনপ্রিয়তা হারালে এরা সরকারকে জনবিরোধী আখ্যা দেয় আবার জনদরদি বাজেট পেশ করলে এরা প্রচার করতে শুরু করে এই বলে যে 'সরকার সংস্কার-কর্মসূচি গ্রহণে সাহস দেখাতে পারেনি' ইত্যাদি ইত্যাদি। এরাই কর্পোরেট লবির হয়ে সরকারকে উত্যক্ত করে ব্যাঙ্কের সুদ কমানোর জন্য।

বর্তমান মোদী সরকার সকলকে অবাক করে এবারের বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার গ্রামীণ কর্মনিযুক্তি নিশ্চয়তা প্রকল্পে (NREGA) বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে। অথচ এই সরকারই ক্ষমতায় বসে এই প্রকল্পকে ফালতু দানছত্র বলে কটাক্ষ করেছিল। অবাক করার মতো ঘটনা হলো এই প্রকল্প ছাড়াও গ্রাম্যজীবনে অনেক রকমের নিশ্চয়তা দানের প্রতিশ্রুতিও এবারের বাজেটে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কী সত্যি মোদী সরকার তথাকথিত কর্পোরেট-বান্ধব 'অর্থনৈতিক সংস্কার' কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করার পথে অগ্রসর হলেন? আমার তা মোটেই মনে হয় না, কারণ এবারের বাজেটের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়তে পারে আগামী কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে। সেই দিক থেকে এটি রাজনৈতিক চমক বলেই মনে হয়। নির্বাচনের পর স্বমূর্তি ধরা তো আমাদের সংসদীয় রাজনীতিরই অঙ্গ। কেননা আমাদের সংসদীয় রীতিতে দায়বদ্ধতা ব্যাপারটাই নেই। এবারের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালিত হলো কিনা, পরের বছরের বাজেটে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়বদ্ধতা সরকারের উপর নেই।

এবারের বাজেটে সবটাই যে জনমুখী ও শ্রমিক-কৃষকদরদি হয়েছে তা কিন্তু নয়। সরকারের শ্রমিক-বিরোধী চারিত্রিক দোষ এবারও বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রমিকের সঞ্চিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার উপর ট্যাক্স চাপিয়েছে সরকার। যুক্তি হলো শ্রমিকগণ যাতে অবসর গ্রহণের পর টাকা তুলে না নিয়ে বেসরকারি পেনশন প্রকল্পে টাকা জমা রাখে আজীবন। অদ্ভুত কর্পোরেট মানসিকতা। সরকারের নিজস্ব পেনশন প্রকল্প Employees Pension Scheme 1995 শ্রমিক সহায়ক করার দাবি বহু বছর ধরে করা হলেও আগের সরকারের মতো এই সরকারেরও কোনো সদিচ্ছা নেই। ২০০৪ সাল থেকে এই বিজেপি সরকারই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের Central Civil Service Pension Scheme তুলে দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, এবারের বাজেটেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজি অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ (এনপিএ) অধিগ্রহণের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত Asset Reconstruction Company-গুলোর হাতে। জাতীয় শিল্প তাতে কতদিন জাতীয় থাকবে এ শঙ্কা অমূলক নয়। মোদী সরকার শিল্পোন্নয়নের কথা বললেও জাতীয় জীবন গড়ার মূল সূত্রটি বুঝতে পারেননি বলেই আমি গোখেলজীর একটি উক্তি তুলে ধরেই এই লেখাটি শেষ করতে চাই : "আমি বারবার বলেছি এবং আবারও বলছি যে স্বদেশি আন্দোলনের আলোড়ন শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়নের জন্য নয়, বরং আমাদের জাতীয় জীবনের উৎকর্ষতাকে সর্বতোভাবে বাড়ানো।" ■

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC
POWDER
CUMIN
CORIANDER
RED CHILLI
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

নিরপেক্ষতা না সুবিধাবাদ?

চিঠিপত্র

সম্প্রতি অসহিষ্ণুতার পাশাপাশি একটি নতুন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে, যা নিয়ে সমস্ত দেশ উত্তাল। সংসদে হামলাকারী দেশদ্রোহী জঙ্গি ফাঁসি সাজাপ্রাপ্ত আফজল গুরুর সমর্থনে দিল্লীর জে এন ইউ-তে কিছু বামপন্থী ছাত্রসংগঠন মিছিল করে এবং জনসমক্ষে তারা পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান তোলে। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল। কলকাতায় বামপন্থী ও কংগ্রেসীরা জোট মিছিল করেছে। এর প্রতিবাদে কে বা কারা দিল্লীর সিপিএমের প্রধান কার্যালয়ের দেওয়ালে ও ব্যানারে কালি লেপে দেয় এবং দেওয়ালে দেশদ্রোহী, পাকিস্তানের দালাল ইত্যাদি লিখে দিয়ে যায়। কিছু নেতাকে ফোনে হুমকিও দেওয়া হয়। আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, কাজটা যারাই করে থাকুক তা ঠিক করেনি। প্রথমে যাদবপুরের ছাত্র ছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে মিছিল করে এবং তারপর একটি পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই একই ইস্যুতে মিছিল ডাকা হয়। এর প্রতিবাদে এবিভিপি পাল্টা মিছিল করলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অরুন্ধতী রায় বলেছেন, কাসবকে ফাঁসি দিয়ে ভারত ভুল করেছে। মন্দাকান্তা সেনের মতো নেত্রীরা দাদরি নিয়ে দেশে অসহিষ্ণুতা খুঁজে পান কিন্তু দেগঙ্গা, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, মল্লিকপুরের উস্তি, বর্ধমানের সমুদ্রগড়, নদীয়ার কালিগঞ্জ, মালদার কালিয়াচকের ঘটনা এঁদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়। যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি কলেজের বাম ছাত্ররা ন্যাপকিন নিয়ে, প্রকাশ্যে চুমু খেয়ে, ব্রা-প্যান্টি পরে, গীতা-পৈতা পুড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রদর্শন করে। সিপিএমের অনেক নেতা প্রকাশ্যে গো-মাংস খান। এটা নাকি ধর্মনিরপেক্ষতা। এর আগে মরিচঝাঁপি, বিজনসেতুতে বাম সরকারের আমলে হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঘটেছে একের পর এক গণহত্যা ও ধর্ষণকাণ্ড।

'৮৯ সালে কাটরা মসজিদে নামাজ পড়ার নাম করে দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু রাতারাতি সব প্রমাণ লোপাট। এঁরা তসলিমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাঁকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। এঁরা আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরোধিতা করেন কিন্তু আকবরউদ্দিন, সিদ্দিকুল্লা কিংবা জাকির নায়েকের বিষয়ে নীরব থাকেন। এঁরা প্রকাশ্যে চীনকে সমর্থন করেন। এঁরাই হলেন প্রকৃত শিক্ষাবিদ, কারণ এঁরা একটা সময় ইংরেজি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ এঁরাই নিজেদের ছেলেমেয়েকে বাড়িতে ভালো টিচার রেখে ইংরেজি পড়ান, আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন উচ্চশিক্ষার জন্য।

কিছু বুঝতে পারছেন? এঁরা নিরপেক্ষতার আড়ালে কী করতে চাইছেন? বামপন্থীরা এতোটাই দেশ প্রেমিক যে ১৯৪৭ সালে এঁদের স্লোগান ছিল--- 'আগে পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' ১৯৬১ চীন ভারত আক্রমণ করলে এরাই বলেছিল— 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই।' বামপন্থীরা ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি এতোটাই শ্রদ্ধাশীল যে মনীষীদের সুন্দর সুন্দর উপাধি দিয়েছিলেন। যেমন— নেতাজী 'তোজোর কুকুর, জাপানের দালাল', রবীন্দ্রনাথ 'বুঁর্জোয়া কবি', বিবেকানন্দ 'বেকার পাগলা যুবক-ভণ্ড সন্ন্যাসী', রামকৃষ্ণ 'যক্ষা ও মৃগী রোগী', সারদা দেবী 'ঘুঁটে কুড়ানী'। এমনকী যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম সেই শ্যামাপ্রসাদকে এঁরা সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়েছেন। এইভাবে এঁরা ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির সেবা করেন। জে এন ইউ-তে আফজল গুরু ও ইয়াকুব মেনেনের ফাঁসির বিরোধিতা এবং 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়া এঁদের কাছে বাক্‌স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার। 'কিতনে আফজাল মারোগে? ঘর-ঘর সে আফজাল নিকলেগা। ইন্ডিয়া গো ব্যাক! পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'— এগুলো বলা নাকি বাক্‌স্বাধীনতা। 'যো লোগ মন্দির যাতে হ্যায়, ওহ লোগ লড়কী ছেড়তে হ্যায়।'— কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধী। 'যো ডরতে হ্যায়, ওহ মন্দির যাতে হ্যায়।'— আমির খান। 'আগার মোদী প্রধানমন্ত্রী বন গয়া তো ম্যায় দেশ ছোড় দুংগা।' —শাহরুখ খান। 'কাশ্মীর কোনোদিনই ভারতের অংশ ছিল না।'— কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টির নেতা ফারুক আব্দুল্লা। '১৫ মিনিটকে লিয়ে দেশসে পুলিশকো হাটাদো, হম ১০০ ক্রোর হিন্দুকো দিখাদেংগে, কৌন তাকাতবার হ্যায়। ভগবান রামকী মা কাহা-কাহা গয়ী থী, কিসকিসকে সাথ শোয়ী থী।'--- হায়দরাবাদের এমএলএ আকবরউদ্দিন ওয়েসি। 'বেশ করবো সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করবো।'— মমতা ব্যানার্জি।

ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে যদি এগুলো সহিষ্ণুতা ও বাক্ স্বাধীনতার উদাহরণ হয় তাহলে কমলেশ তিয়ারীর বক্তব্যের ক্ষেত্রেও তো সেটা বাক্ স্বাধীনতারই অংশ হওয়া উচিত? দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বললেও কেউ ধর্মনিরপেক্ষ ও দেশপ্রেমী হয় তাহলে 'আগার হিন্দুস্তান মে রেহেনা হোগা তো জয় শ্রীরাম কহনা হোগা' বললেই আপনারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান কেন?

আপনারা কি আদৌ নিরপেক্ষ নাকি সুবিধাবাদী? এর জন্য আমার কাছে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না। নিজের মনকে প্রশ্ন করুন আর নিজেই জবাব দিন। আপনারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতেই পারেন, কিন্তু তাই বলে দেশদ্রোহীদের প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন, দেশদ্রোহীদের প্রশ্রয় দেওয়া হলো পাপ আর পাপীদের ভগবান ক্ষমা করেন না।

—দিব্যজ্যোতি পণ্ডিত,
কাঞ্চনতার, মালদহ।

দেশদ্রোহিতা ও ভোটের রাজনীতি

সাম্প্রতিক দেশের একটি বিশেষ ঘটনা মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। সিয়াচেনে কর্তব্যরত ১০ জন ভারতীয় জওয়ান তুষার ঝড়ে তাদের জীবন দিয়ে গেলেন দেশের জন্য। এই ঘটনায় গোটা দেশ যখন শোকে বিহ্বল, ঠিক সেই সময়ে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি অতিবাম ছাত্র গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের নামে দেশদ্রোহী কাজ সংগঠিত করার ঘটনা। তারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বলে পোস্টার দেয়, যার বিষয়বস্তু ছিল,--- 'ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা ও আফজল গুরুর বিচারবিভাগীয় হত্যার প্রতিবাদ'। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে স্লোগান দেয়— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কাশ্মীরের আজাদি চাই', 'আফজল গুরুর হত্যার জন্য আমরা লজ্জিত', 'ঘরে ঘরে আফজল জন্মাবে', 'ভারতকে আমরা টুকরো করবো'— যা চুড়ান্ত দেশবিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। তবে এই বিষয়ে অবাক হওয়ার অবকাশ নেই। কারণ বামেদের চরিত্রই হলো দেশবিরোধী। এরা ১৯৪৫-এ মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছিল। এরাই ১৯৪৭-এ স্বাধীনতাকে 'ঝুটা আজাদি' বলেছিল। বামেরা নেতাজীকে বলেছিল 'তোজোর কুকুর', আর ১৯৬১ ভারত-চীন যুদ্ধের সময় দেশের ভিতর থেকে চীনকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তাৎপূর্ণ বিষয় হলো, বামেদের এই দেশদ্রোহী কাজকে বাকস্বাধীনতার নাম দিয়ে সমর্থন করছে কংগ্রেস দল ও তাদের স্বঘোষিত যুবরাজ রাহুল গান্ধী এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর এর মধ্য দিয়েই তারা তাদের রাজনৈতিক দৈন্য প্রকাশ করে ফেলেছে দেশের সামনে। সবচাইতে ভয়ঙ্কর দিক হলো প্রতিবাদের দুটি বিষয়। প্রথমত, 'ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা'। ভারতে এক সময় জাতগত বিভেদ প্রবল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই ৬৯ বছরে এটা প্রায় অবলুপ্তির পথে। এখন ভারতীয় সমাজে জাতিগত বৈষম্য নেই বললেই চলে। কিন্তু আজ এই তথাকথিত সেকুলারদের রাজনৈতিক দীনতার কারণ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ। আর সেটা উপলব্ধি করেই রাজনৈতিক স্বার্থে এতদিনের ধর্মীয় বিভাজনের রাস্তা থেকে আর একটি গলি খোঁজার চেষ্টা করছে এই নীতিহীন রাজনৈতিক দলগুলি, যেটি হলো জাতিগত বিভেদ। দীর্ঘ ৬৯ বছরের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এই নোংরা প্রবণতার বিরুদ্ধাচারণ করা এখন আমাদের অতি আবশ্যক কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, বাম ছাত্ররা ভারতের সংসদে হামলার অন্যতম আফজল গুরুর ফাঁসিকে 'বিচারবিভাগীয় হত্যা' আখ্যা দিয়ে ভারতীয় আইন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও রাষ্ট্র কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এই দেশবিরোধী কাজকে সমর্থন করছে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা।

এই ঘটনা শুধু জে এন ইউ-তেই নয়, এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে দেশের সমস্ত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেগুলি বামেদের আঁতুড় ঘর বলে পরিচিত। আমাদের দেশের বীর জওয়ানরা প্রতিনিয়ত সীমান্তে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করে তাঁদের প্রাণ বলিদান দিচ্ছে আমাদের সুরক্ষার জন্য আর দেশের মধ্যে থেকে আমাদের ট্যাক্সের টাকায় কিছু ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা জঙ্গিদের সমর্থন করছে নির্দ্বিধায়। আজ আমরা এক বড় প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই পরিস্থিতিতে দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী? আমরা গণতন্ত্র ও বাক্‌স্বাধীনতার নামে দেশদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত এই বিকৃত মস্তিষ্ক ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে, নাকি সংস্কৃত সমৃদ্ধ এই দেশের পক্ষে? এই গভীর চিন্তা ও তদোপযোগী কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

—**পার্থ বটব্যাল,**
কাটোয়া, বর্ধমান।

'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়দেবের মেলায় হাতে একটি একতারা নিয়ে বোধহয় বোষ্টমি হয়ে বলতে চাইছেন 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'। অর্থাৎ সরকারি টাকা অর্থাৎ ফলওলার দেওয়া টাকা, সারদার টাকায় এতদিন ধরে বিষমদ খেয়ে মারা গেলে তাদের পরিবারকে দুই লক্ষ করে টাকা দান রাজ্যের যাবতীয় ক্লাবগুলোকে, আগত বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে দুই কিস্তিতে তিন লক্ষ টাকা করে দান, প্রথমে মাদ্রাসার ছাত্রীদের ও মুসলমান ছাত্রীদের সাইকেল দান, পরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভেক ধরে সকল ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দানে প্রচুর সরকারি অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে। সেই সাইকেল প্রাপক ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই সাইকেলগুলি বিক্রির জন্য খবরের কাগজে ও ফেসবুকে জানিয়ে দিয়েছে। এই সংবাদটি কিছুটা ঝামা ঘষে দেওয়ার মতো নয় কী? নিন্দুকরা কি বলেন? এসব কাণ্ডকারখানা করে অসদুপায়ে পাওয়া অর্থের প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে যাওয়াতে তিনি কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলায় গিয়ে একতারা হাতে নিয়ে বলতে চাইছেন যে--- 'আমি এখন ভিক্ষুকের ভূমিকায়, হাতে টাকা নেই। তোমরা (সারদা, রোজভ্যালি ও মহম্মদ সোহরাব) আমায় টাকা দাও। তাই দিয়ে আগামী বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে আরও সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ভোট কিনব'। আমাদের ঠিক জানা নেই, হয়তো বা কেউ দয়া পরবশ হয়ে বেশ কিছু দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই দরদ উথলে উঠেছে প্রাইমারিতে জুতো দেওয়ার জন্য। কারণ শুধু সাইকেল দিলেই তো হবে না। খালিপায়ে সাইকেল চালালে পায়ে লাগবে তো! তাই গোরু মেরে জুতো দান করার ইচ্ছা হয়েছে। তাঁর হয়তো বা স্মরণে নেই, তাই বলি জুতো দিলে ছাতা দিতেই হয়। তিনি তো পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার শ্রাদ্ধ করে ছাড়ছেন। তাই জুতোর সঙ্গে ছাতাটি অপরিহার্য। কয়েকশো বছর আগে মহম্মদ বিন তুঘলক ভাবতেও পারেননি তাঁর থেকে খামেখেয়ালি কেউ হতে পারে। তিনি বেঁচে থাকলে গলায় দড়ি দিতেন।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি

নিরোদ চন্দ্র শর্মা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
—স্বামী বিবেকানন্দ।

উপরিউক্ত সঙ্গীতাংশটির বিষয়বস্তু যাকে নিয়ে রচিত সেই দেবতাটির পরিচয় ভক্ত অনুরাগী মাত্রই অবগত আছেন। যাঁর জটামাঝে গঙ্গার গর্জন, অনল উদ্‌গীরণ করে ত্রিশূল ফলায়, যাঁর ললাটে চন্দ্র বিরাজমান। তিনি যে শিব, মহাদেব, পঞ্চানন একথা বলাই বাহুল্য।

শিব কে? শিবকালীর খেলা কিরূপ? "মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের উন্নত করেন বলে এঁকে শিব বলা হয়। শিব হলেন পুরুষ (Potential energy of this universe) এবং কালী হলেন প্রকৃতি বা (Kinetic Energy of this Universe)। পুরুষ কেবল স্রষ্টা, অধ্যক্ষ বা ঈক্ষণকারী, আর মহাপ্রকৃতি কালী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময়, নিয়ত (সর্বদা) নৃত্যশীলা বা লীলাপরায়ণা অর্থাৎ অবিরত সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

Kinetic শক্তি Potential শক্তি থেকে আসছে। তাই মা এক পা (kinetic energy) শিবের বুকে (potential energy) রেখে বা ছুঁয়ে এনার্জি পাচ্ছেন আর বিশ্বের ভাঙাগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন" (কথামৃত চেতনা : পৃ. ৩৫)। মহাদেবকে আশুতোষও বলা হয়। কেননা তিনি সাধককে ঈপ্সিত বর দেন এবং অতি সহজেই।

মহাভারতের মহাদেব— বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়েছেন। যদিও মহাদেব ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় তা নিয়ে নানা কথা রয়েছে। যদিও ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই করেন মহাদেবের পূজা। তিনি মহাকাল। সর্বসংহারক। আবার তাঁর থেকে অভ্যুদয় হয়। সেজন্য তিনি শিব বা শঙ্কর নামে জননশক্তি। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনে যেমন শিবসদৃশ দেবতা, অশ্বমেধতুল্য যজ্ঞ ও গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নেই, তদ্রূপ এই ত্রিভুবনে শিব চতুর্দশীব্রত সম অন্য কোনো ব্রত নেই।

প্রভুমীশমনীশম অশেষ গুণং
গুণহীন মহীষগরাভরনম্।
রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।।

যিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর, যার উপরে অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, যিনি অশেষ গুণশালী অথচ নির্গুণ, নাগরাজ বাসুকির গরল যাঁর আভরণ, যিনি রণে দুর্জয় দৈত্যপুরী জয় করেছেন সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষরূপী শিবকে প্রণাম করি।

"জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, সাধকজনগণ মানস বিহারী।"

তিনি বেল পাতা নেন মাথা পেতে। তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী। গাল বাজালে তিনি হন খুশি। মান অপমান তাঁর কাছে সব সমান। মহাদেব যখন একদিন হিমালয়ে ঘোর তপস্যা করছিলেন তখন পার্বতী খেলার ছলে তাঁর চোখ দুটি পেছন থেকে হাত দিয়ে ঢেকে ফেললে সমগ্র জগৎ অন্ধকারে ডুবে যাবে বুঝে, মহাদেবের কপালে তক্ষুণি এক জ্বলন্ত চোখের উদ্ভব হয়। এইটিই ওই মহাদেবের ধ্বংসকারী তৃতীয় নেত্র। ওই চোখের আগুনেই কামদেব পুড়ে যান।

এই তৃতীয় চোখের আগুনে একবার হিমালয়ও পুড়ে গিয়েছিল। পরে তা আবার পার্বতীর প্রীতির জন্য মহাদেবই হিমালয়কে পরম রমণীয় করে তোলেন। আমরা জানি--- ব্রহ্মা সৃজনকর্তা। শুধু দেহের (আত্মার নয়), বিষ্ণু পালনকর্তা শুধু দেহের (আত্মার নয়), মহাদেব সংহারকর্তা শুধু দেহের (আত্মার নয়)। বেদে মহাদেব নামে কিছু নেই। তবে রুদ্র বলে এক দেবতার উল্লেখ আছে। ওই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেব হয়েছেন। শিবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। শিবের ধনুকের নাম পিনাক। তাই তাকে পিনাকপাণি বলা হয়। পিনাকী শিবের বিধ্বংসকারী অস্ত্রের নাম পাশুপত। তবে প্রলয়কালে মহাদেব বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংস কার্য করেন।

মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা অল্পেতে পূরণ করেন বলে তাঁকে আশুতোষ বলা হয়। মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেছিলেন বলেই ত্রিপুরারি। এছাড়া তাঁর অন্যান্য নামও রয়েছে।

মহাদেব ত্রিপুরারি কেন? পদ্মপুরাণে রয়েছে তারকাসুরের তিন পুত্র— তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। এরা কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এই বর পেল যে তারা তিনজন তিনটি কামগামী (electronic) আকাশস্থিত নগরে বাস করবে এবং কেউই তাদের মারতে পারবে না। হাজার বছর পরে এদের তিনটি পুর (নগর) এক হলে (docked) অবশ্য তারা তিনজন আবার একসঙ্গে মিলবে তখন যদি কেউ এক বাণে ওই সম্মিলিত ত্রিপুর (docked Towns) ভেদ করতে পারে তাহলে মাত্র তাদের মারা যাবে।

ময়দানব ওই ত্রিপুর স্বর্গে, অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে তৈরি করে

দেন। ওই ত্রিপুরে তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী আশ্রয় নিয়ে ত্রিলোকে নানা অত্যাচার শুরু করে। ব্রহ্মার বরে তাদের কেউ কিছু করতেও পারল না। তখন এই ত্রিপুরাসুরদের বধ করার জন্য দেবতারা মহাদেবের কাছে গেলে মহাদেব তাদের তাঁর দেহের অর্ধেক নিয়ে ত্রিপুর ধ্বংস করতে বলেন।

কিন্তু দেবতারা মহাদেবের তেজ ধারণ করতে পারবে না বলায় মহাদেব দেবতাদের তেজের অর্ধেক গ্রহণ করলেন এবং দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজযুক্ত হলেন এবং মহাদেব আখ্যা পেলেন।

তারপর বিশ্বকর্মা পৃথিবী দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, গ্রহনক্ষত্র এসব দিয়ে এক রথ তৈরি করলেন। চন্দ্র ও সূর্য দিয়ে চাকা গড়লেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ঘোড়া হলো, সুমেরু পর্বত হলো ধ্বজ এবং পতাকা হলো মেঘ। সংবৎসর হলো ধনু, কালরাত্রি হলো জ্যা। বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র বাণ হলেন। ব্রহ্মা হলেন সারথি। এরপর ত্রিপুর অভিমুখে যাত্রা করা হলো। পথে বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভারে রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। তখন বিষ্ণু বাণ থেকে বেরিয়ে বৃষরূপে মাটিতে বসে যাওয়া রথ উঠিয়ে দিলেন। মহাদেব তখন বৃষরূপী নারায়ণ ও অশ্বের পিঠে পা রেখে ধনুতে জ্যা লাগিয়ে তাতে পাশুপত অস্ত্র লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় দানবদের তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর তিনপুর (নগর) এক হয়ে যাওয়ায় (docked) মহাদেব পাশুপত বাণ মেরে ত্রিপুরকে দগ্ধ করে পশ্চিম সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এজন্য মহাদেবের নাম হলো ত্রিপুরারি। রুদ্র ক্রুদ্ধ হলে ধ্বংস করেন আর সন্তুষ্ট হলে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আবার তিনি রোগও দূর করেন। তিনি একাধারে তাই রুদ্র অর্থাৎ ভয়ানক, আবার শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

মহাদেবকে মহাকালও বলা হয়। কারণ তিনি সর্বসংহারক। আবার তার থেকেই অভ্যুদয় হয়। সেজন্য তিনি শিব ও শঙ্কর নামে জননশক্তি।

যা ধ্বংস হচ্ছে তাই আবার জন্মাচ্ছে। তাই মহাদেব ঈশ্বরও অর্থাৎ সর্বশক্তিমান মহাদেব। ভৈরবও তিনি। আবার তিনিই মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী— কঠোর তপস্যা ও ধ্যানের প্রতীকস্বরূপ।

মহাদেব সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। মহাদেবের বাসস্থান কৈলাস। কুবের তাঁর ধনরক্ষক। পার্বতী তাঁর স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁর পুত্রকন্যা। মহাদেব শ্মশানে সর্পজড়িত মস্তকে কঙ্কাল মালা ভূষিত হয়ে বাস করেন। মহাদেবের ধ্বংসকারী নাচকে তাণ্ডব বলে।

''নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্;
শিঙা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্।।''
—স্বামী তপানন্দ

গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য নেচেছিলেন। তিনি আবার নৃত্যকলারও উদ্ভাবক। তাই তিনি নটরাজ। তাঁর দিকে তাকালে আমরা দেখব— তাঁর ললাটে ত্রিনয়ন। তার উপরে অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলায় সাপের উপবীত। হাতে ডমরু, দুর্গতদের শাস্তির জন্য গদা। তাঁর বাহন নন্দী। মহাদেব মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যে মহাদেব তথা শিবের অসংখ্য কাহিনি আছে। অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বর পাটনির সঙ্গে অন্নদার কথোপকথন যদিও বাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে তথাপি আধ্যাত্মিক সাহিত্য পাঠক মাত্রই এই অলঙ্কার প্রয়োগ শিবের মাহাত্ম্য বলেই আনন্দ পান--- 'ঈশ্বরীকে যখন ঈশ্বরী (ভগবতী) বলেন— 'অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন'— এই বৃদ্ধ পতিটি যে শিব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর গাত্রবরণ ধোঁয়াটে বা ধূম্রবর্ণ বলে তাঁকে ধূর্জটি বলা হয়। মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের উন্নত করেন বলে তাঁকে শিব বলা হয়। সকল পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে পশুপতি বলা হয়।

শব বা শিবের বাসস্থান শ্মশান। কেন? —ইহকালের বা ইহজন্মের কর্মফল ভোগান্তে জীবের শেষ বিশ্রামস্থান। শ্মশানই শবের বা শিবের শয়নস্থান। তাই শ্মশানেই কালী (kinetic energy) স্থিরভাবে বসে করেন। শুধু জীবনেরই শেষে নয়, কল্পান্তেও তাঁর আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়।

ব্রহ্মপুরুষ শিব কালীর পদতলে কেন? ''কালী যেমন শিবের অধীন, শিবও তেমনি কালীর অধীন। শিব হলেন পুরুষ (Potential Energy of this Universe) এবং কালী হলেন প্রকৃতি বা (Kinetic Energy of this Universe) (কথামৃত চেতনা ৩৫ পৃ.)। শিবরাত্রি ব্রতকথায় আছে মাতা পার্বতী কৈলাস পর্বতে শিবকে জিজ্ঞেস করলেন— ''হে ভগবান! আপনার সন্তোষই মানুষের ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষলাভের কারণ। মানুষ কী তপস্যা, ব্রত অথবা কী কর্ম করলে আপনি সন্তোষ লাভ করেন?''

ভুবনমোহিন হাসি হেসে ভগবান শঙ্কর বললেন— ''হে প্রিয়ে! ফাল্গুনমাসের ঘোর অন্ধকার চতুর্দশীর রাত্রিটির নাম শিবরাত্রি। তাই রাত্রিতে উপবাস করে মানুষ আমার কৃপা সর্বাধিক লাভ করবে। স্নান, মন্ত্র, জপ, পূজা, ধ্যানের চাইতেও শিবরাত্রির উপবাসে আমি সর্বাধিক প্রসন্নতা লাভ করি।

নিয়ম : শিবরাত্রি পূর্বদিনে ত্রয়োদশীতে একবার মাত্র স্নান করে নিরামিষান্ন বা হবিষ্যান্ন ভোজন করে তৃণশয্যায় শয়ন করবে। প্রভাতে জাগরণের পর আবশ্যকীয় নিত্যক্রিয়াদি শেষ করে বিল্বপত্র চয়ন করবে। শিবপূজাতে সকল বস্তু অপেক্ষা বিল্বপত্রই শ্রেয়। বিল্বপত্র দ্বারা পূজায় আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করি, মণি, মুক্তা, প্রবাল, হিরা, স্বর্ণ ও পুষ্পাদিতে তত প্রীত হই না। দুগ্ধাদি দ্বারা প্রহরে প্রহরে স্নান করিয়ে গন্ধাদি দ্বারা আমার পূজা করতে হবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধুর দ্বারা আমাকে স্নান করাবে। মূলমন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি পূজা এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করবে। পরের দিন আমার ভক্ত 'ব্রতী' ব্রাহ্মণগণকে পূজা- ভোজন করিয়ে পারণ করবে। হে দেবী ভগবতী! এই পূজা ব্রত দ্বারা আমার অত্যন্ত প্রীতি হয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সহকারে মানুষ এই ব্রতের কিয়দংশ ফলও লাভ করতে পারে না।''

আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি— এই জন্মে হস্তপদদ্বারা কৃত অপরাধ, বাক্যজ, শরীরজ, কর্মজ, শ্রবনজ, নয়নজ কিংবা মানস অপরাধ অথবা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ সকলই তুমি ক্ষমা কর। হে করুণাসাগর শ্রী মহাদেব শম্ভু, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক, জয় হউক।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

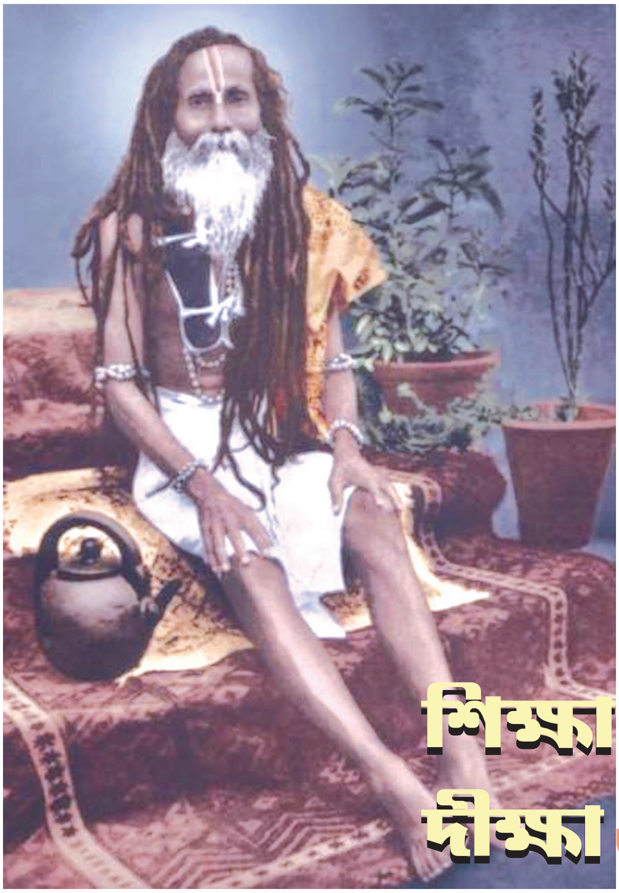

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু সীতারামদাস

রূপশ্রী দত্ত

ভারতবর্ষ সাধুসন্তের দেশ। তাঁদের অধ্যাত্মসাধনা, মানবকল্যাণ, ঈশ্বরের নাম প্রচার ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২। মহাপ্রয়াণ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২। বাংলা মাসের ৬ ফাল্গুন পঞ্চমী তিথিতে তাঁর জন্ম। সেই পুণ্যতিথি তাঁর নামাঙ্কিত 'ওঙ্কার পঞ্চমী' নামে পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডারের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে।

তাঁর পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চিকিৎসক। মায়ের নাম মাল্যবতী দেবী। তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন ব্রজনাথ। প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে দিগ্‌শুই গ্রামের দাশরথিদেব যোগেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সীতারামদাসের পূর্বজীবনের নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মধ্যরাত্রে ধ্যান করার সময় বালক প্রবোধ শিবদুর্গার দিব্যদর্শন লাভ করেন। আরও শৈশবে তিনি শিবের দর্শন লাভ করেন। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী। তিনি সহধর্মিণীকে দিগ্‌শুই গ্রামে গুরু দাশরথি ও গুরুমা'র দর্শনলাভ করিয়েছিলেন। গুরু দাশরথিই তাঁর নামকরণ করেছিলেন সীতারাম। ওঙ্কারনাথ নামটি দিয়েছিলেন ধ্রুবানন্দ গিরি।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তাঁর দিব্যদর্শন হয়। জগন্নাথ তাঁকে বলেছিলেন— 'যাও, নাম প্রচার কর।' তিনি তখন ভগবৎ নাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। এছাড়া, তিনি নানা জনকল্যাণমূলক কার্যে উদ্যোগী হন। দরিদ্রদের খাদ্য, বস্ত্রদান, দরিদ্র পিতামাতার কন্যার বিবাহে সাহায্য করা, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁর মহৎ কার্যাবলীর অন্তর্গত। ভারতের চতুর্দিকে ২৯টি অখণ্ড নামকীর্তনের সঙ্ঘ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৫০টি ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়, সতী সঙ্ঘ, যুবক সঙ্ঘ, বিদ্বৎ সঙ্ঘ— এইসব প্রতিষ্ঠান তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে গঠিত। অনেক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। যেমন 'পথের আলো', 'দেবযান', 'জয়গুরু', 'আর্যনারী' ইত্যাদি। 'মহামিলন মঠ' তাঁর উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী, সেনাবিভাগীয় কর্মী, রাজনীতিবিদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহ ও আধ্যাত্মিক গভীরতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমসাময়িক অন্যান্য সাধু। এঁদের মধ্যে ছিলেন মোহনানন্দ মহারাজ, মা আনন্দময়ী, দলাই লামা, স্বামী চিদানন্দ। তাঁর শিষ্য কিঙ্কর উমানন্দ তাঁর উপদেশাবলী পুস্তকাকারে সংগৃহীত করেছিলেন। সীতারামের তিনটি ধর্মীয় নীতি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

১। 'জগৎ পরিবর্তনশীল'।
২। 'অ্যায়সা দিন নহী রহেগা'।
৩। 'জগদীশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য'।

ইতিহাসের গল্প

বীর হকিকত

তখন বসন্তকাল। আর কদিন পরেই বসন্ত পঞ্চমী, সরস্বতীপূজা। পাঞ্জাবের শিয়ালকোটের একটি মাদ্রাসায় পড়তে যেত একটি বালক। নাম হকিকত রায়। হকিকত হিন্দু ঘরের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসায় পড়তে যেতে হোত। কারণ সেখানকার বাদশাহ সমস্ত গুরুকুল ভেঙে দিয়েছে। নিয়ম করেছে কেউ যদি পড়াশুনা চায় তাহলে তাকে মাদ্রাসায় গিয়ে উর্দু পড়তে হবে। তাই কিছু করার নেই, হকিকত মাদ্রাসায় গিয়েই পড়াশুনা করত। খুব ভালো ছেলে হকিকত। পড়াশুনাতেও ভালো। শিক্ষকরাও তাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু মুসলমান ছাত্ররা এটি সহ্য করতে পারতো না। সেজন্য তারা প্রতিদিন হকিকতের সঙ্গে শয়তানি করত।

সেদিনও এরকম একটি ঘটনা ঘটলো। ছেলেরা সব খেলতে যাবে, হকিকতকেও তারা ডাকতে গেল। হকিকত জানে খেলার নামে তারা ওর সঙ্গে শয়তানি করবে। তাই সে যেতে চাইলো না। বলল—আমার শরীর খারাপ, আমি আজ খেলবো না। কিন্তু কে শোনে তার কথা। সবাই নাছোড়বান্দা, হকিকতকে মাঠে নিয়ে গিয়েই ছাড়বে। হকিকত বলল— মা দুগ্গার দিব্যি বলছি, আমার শরীর খারাপ, আমি যাবো না। অনেক জোরাজুরি করেও ছেলেরা কিছুতেই হকিকতকে মাঠে নিয়ে যেতে পারলো না। এই রাগে তখন তারা মা দুগ্গার নামে খারাপ কথা বলতে লাগলো। শুনে হকিকতের মনে দুঃখ হলো। বলল— তোমরা মা দুগ্গার নামে এমন বলছ, আমি যদি বেগম ফতেমার নামে বলি তাহলে কেমন হবে। সে যেই না একথা বলেছে আর যায় কোথায়? ছেলেরা সব দৌড়ে গিয়ে মৌলানা সাহেবের কাছে নালিশ করলো যে হকিকত বেগম ফতেমার নামে বাজে কথা বলেছে। মৌলানা সাহেব হকিকতকে ডেকে পাঠালেন। হকিকত অনেক বলল, সে বাজে কথা বলেনি। মৌলানা সাহেব শুনলেন না। তিনি হকিকতকে সোজা কাজির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে হকিকতের বাড়িতে খবর পৌঁছে গেছে। মা-বাবা সব ছুটে এল কাজির কাছে। তারপর শুরু হলো বিচার। ছেলেরা সব সাক্ষী দিল। বিচারে কাজি হকিকতকে ফাঁসির নির্দেশ দিল। হকিকতের মা কাজির পায়ে ধরলো, হকিকতের প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।

মায়ের কাকুতি-মিনতি শুনে কাজি বলল— একটি শর্তে হকিকত মুক্তি পেতে পারে, তাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এই শুনে হকিকতের খুব রাগ হলো, সে কিছুতেই মুসলমান হবে না। মা বাবা তাকে বোঝালো, মুসলমান হলে তুই বেঁচে থাকবি নইলে এরা তোকে মেরে ফেলবে। কিন্তু হকিকত ধর্ম পরিবর্তন করতে রাজি হলো না।

তারপর বসন্ত পঞ্চমীর দিন সকালবেলা হকিকতকে ফাঁসি দেওয়া হলো। বীর হকিকত জীবন দিল কিন্তু ধর্ম দিল না।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

হরিয়াণা

উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হরিয়াণা। উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব ও হিমাচলপ্রদেশ। পূর্বে উত্তরাঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লী। দক্ষিণপশ্চিমে রাজস্থান। হরিয়াণার গৌরবময় ইতিহাস বৈদিককাল থেকেই। ইংরেজরা এই রাজ্যকে পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তারপর ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর আলাদা রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আয়তন ৪৪ হাজার ২১২ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৪২ জন। রাজধানী চণ্ডীগড়। ভাষা হিন্দী। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল এই রাজ্যেই। পূর্ব সীমায় যমুনা নদী। রাজ্যে ৪২ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৩৮০টি বড় শিল্প কারাখানা আছে। চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, পিতলের জিনিসপত্র, সাইকেল, ট্রাক্টর, জুতা, টায়ার-টিউব, বনস্পতি ও কম্বল প্রধান উৎপাদিত বস্তু। মহাভারতের ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থল এই রাজ্যেই। এ রাজ্যের পানিপথে তিনটি বড় যুদ্ধ হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্রগুলি হলো, কুরুক্ষেত্রের গীতা উপদেশস্থল, ব্রহ্ম সরোবর, ভদ্রকালী শক্তিপীঠ। চণ্ডীগড়ের চণ্ডীমন্দির। পঞ্চকুলার মনসা মন্দির। গুরুগাঁওয়ের দ্রোণাচার্য মন্দির।

প্রশ্নবাণ

১.স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বাঙালি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে?

২.গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন কোথায় শুরু হয়?

৩.হনুমান থাপ্পা কোথায় শহিদ হলেন?

৪.বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫.মালদ্বীপ কোন্ সাগরে অবস্থিত?

উত্তর : ১. সৌরভ গাঙ্গুলি। ২. দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৩. কার্গিলে। ৪. মদনমোহন মালব্য। ৫. ভারত মহাসাগরে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

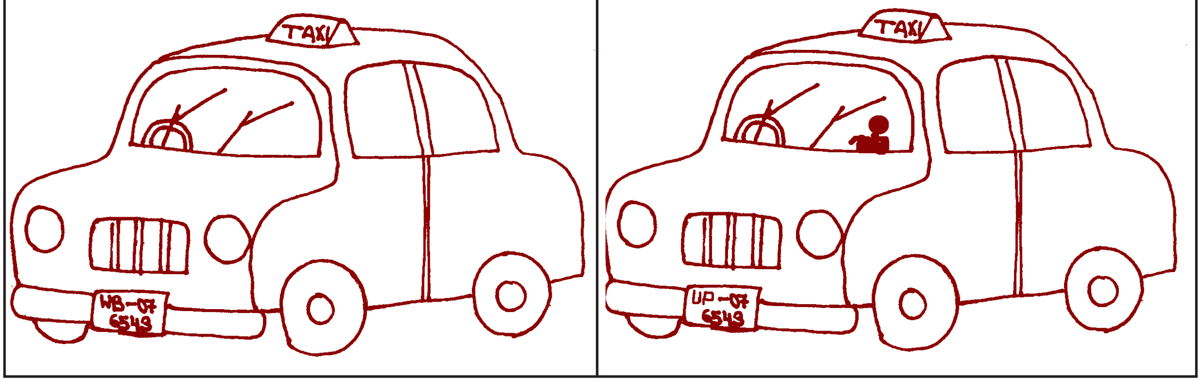

ছোটদের কলমে

বিদ্যাদেবী

নিতু কুমারী সিং, নবম শ্রেণী, টালিগঞ্জ

বীণা হাতে বিদ্যাদেবী
পদ্মফুলে বসে
জ্ঞান দিয়ে যাও
সবার মাঝে
দাতার মতো করে।

তোমার বাহন সাদা হাঁসটি
সেও অনেক জানে
ইচ্ছে করে আমিও বসি
তোমার পাশে গিয়ে
ওই রাজহংস হয়ে।।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

সাধারণ পরিবারের অসাধারণ মেয়েরা

রিনি রায়

'শৌর্য-দৃঢ়তা-কর্মনিষ্ঠা'-র আদর্শমন্ত্রকে অবলম্বন করে ১৯৬২ সালে গড়ে ওঠা ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ বাহিনীতে এক নতুন গৌরব পালক যুক্ত হলো। এবছর থেকেই এই বাহিনীতে মহিলা ব্যাটেলিয়ান নিযুক্ত হলো যারা ইন্দো-তিব্বত সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় দেশের সুরক্ষায় কাজ করবেন। সদ্য দ্বাদশ শ্রেণী পেরনো দীপিকা থেকে শুরু করে সদ্য কুড়ির ছোঁয়া পাওয়া তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর পপি পেঙ্গু, দীপিকা ত্যাগী, আমানদীপ কৌর, অনুশ্রীর মতো মেয়েরা আইটিবিপি-তে যোগ দিয়েছেন। ৮ হাজার থেকে১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ভারত-চীন সীমান্তে কর্কশ জলবায়ু, অতি বন্ধুর ভূপ্রকৃতির মধ্যে শত্রুর লুকোচুরি খেলার মোকাবিলায় পুরুষদের শক্তি শৌর্যের পাশাপাশি নারী শক্তির উপর ভরসা করে, 'নারী-ক্ষমতায়ন'-কে আরও বলিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত সত্যই অভিনন্দন যোগ্য।

পূর্বপ্রান্তে সুদূর অসমের পপি, পশ্চিমে পঞ্জাবের আমনদীপ কৌর, হাপুরের দীপিকা ত্যাগী, উত্তরাখণ্ডের রেণু আর্য, মধ্যপ্রদেশের অনুশ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠলেও কেবলমাত্র দেশ সেবার স্বপ্ন এদের সবাইকে এক সূত্রে বেঁধেছে। দিল্লীর জে এন ইউ-তে অপরাজিতা রাজার মতো মেয়েরা যখন দেশকে টুকরো করার সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছে, মিছিল করছে, তখন আমনদীপ, দীপিকারা দেশের শত্রু নিকেশ করতে মাঠে নেমেছে। দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ হাপুরের দীপিকা ত্যাগীকে অনুপ্রাণিত করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার পরপরই যখন দীপিকা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ডাক পেল, তখন তার স্বপ্নপূরণের আনন্দ তাকে তার দায়িত্বের প্রতি আরো আগ্রহী করে তুললো। উচ্ছ্বসিত দীপিকাকে সেনার খাকি পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে ওই পোশাক তার মধ্যে এক অভূতপূর্ব গর্বের অনুভব সঞ্চারিত করে। পঞ্চকুল্লায় কঠোর প্রশিক্ষণ দীপিকার মনে এমনই আত্মবিশ্বাস জাগায় যে গ্রামের এই একরত্তি মেয়েটি গর্বের সুরে জানায়— 'এখন আর আমরা সমাজের দুর্বল অংশ নই। তুষারাবৃত পর্বতমালা আমাদের মনোবলকে খর্ব করতে পারে না।'

পঞ্জাবের মোগার মিষ্টি মেয়ে আমনদীপ কৌর। বর্তমানে লাদাখে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত। সামান্য গাড়ি সারানোর দোকানের মালিকের মেয়ে আই টি বি পি-র প্রথম মহিলা ব্যাটেলিয়ানের একজন! এ গৌরব শুধু মোগাকে নয়, সমগ্র পঞ্জাবকেই গৌরবান্বিত করেছে। বছর একুশের এই তরুণীর সাতকুলের কেউই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তার দূর সম্পর্কের এক দাদু চীনে ছিলেন যা আমনদীপের মনে ওই দেশ সম্পর্কে এক আকর্ষণ তৈরি করেছিল। আর ইন্দো-তিব্বত পুলিশ বাহিনীতে যোগদান তার এই মনের আশার একধাপ সম্পূর্ণ করলো। এই বাহিনীর গৌরবান্বিত মহিলাদের তালিকায় পরবর্তী সংযোজন মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রৌলি জেলার অনুশ্রী। অতি সাধারণ অনুশ্রীকে দেখলে বোঝা দায় যে এই মেয়েটা সেনাবাহিনীর কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এমন একটা সময় ছিল যখন অনুশ্রী অস্ত্রশস্ত্র দেখলে খুব ভয় পেত। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর এখন সে অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে। নিকট ভবিষ্যতে সে ওই অস্ত্র হাতেই সীমান্তের পেট্রোলিং ইউনিটের একজন সদস্য হয়ে সীমান্তে টহল দেবে। সমতলের অনুশ্রী পার্বত্য অঞ্চলের কষ্টকর জীবনযাত্রা, প্রতিকূল আবহাওয়া সম্পর্কে শুনেছে কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। তবুও আত্মবিশ্বাসী অনুশ্রী বলে, 'আমি সেখানে যাবো, থাকবো এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবো। কোনো অসুবিধাই হবে না। আমার নিজের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা আছে।'

সুদূর পূর্ব ভারতের অসমের লখিমপুর জেলার ধাকুয়াখানার কেজুরি গ্রাম। এই গ্রামেরই এক গণ্যমান্য পরিবার পেগু। পরিবারের কর্তা পবিত্র কুমার পেগু দূরবর্তী সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এইরকম পরিবারে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বয়ে আসে এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। সেনাবাহিনীর কঠিন প্রশিক্ষণ এই গ্রাম্য হাসিখুশি সরল মেয়েটিকে করে তুলেছে বজ্রকঠিন। অন্যদের মতো আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পপিও তাই ইউনিফর্মের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট। তীব্র কনকনে ঠাণ্ডা পাহাড় তার সাহস ও দৃঢ় মনোবলের কাছে কিছুই নয় বলে জানিয়েছে সে।'

দেশের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবিলায় সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ়চেতা, জাতির প্রতি দায়বদ্ধ এই সকল তরুণীদের প্রতি দেশের অনেক আশা-প্রত্যাশা। ■

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

রূঢ় সত্যকে চাপা দিতে তথাকথিত লিবারেল মিডিয়া বাস্তবকে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে

বহুদিন আগে হায়দরাবাদ শহরে একটি বিশেষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল। তিনি তখন ২৫ বছর আমেরিকার টেক্সাস শহরে একটি ছোট কোম্পানিতে চাকরি করার পর সদ্য সদ্য হায়দরাবাদে ফিরেছেন। কথা প্রসঙ্গে আমরা তখন সদ্য সমাপ্ত আমেরিকান নির্বাচনে জর্জ বুশের কান ঘেঁষা জয় নিয়েও আলোচনায় মেতেছিলাম। ভদ্রলোককে আমার আমেরিকার রাজনীতি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল বলে আদৌ মনে হয়নি। যাই হোক, তবু তিনি দুম করে বলে বসলেন— 'আমার বেশ মনে হয় বুশ নির্বাচনে জোচ্চুরি করে জিতেছেন। কেননা আমার তো বিশ্বাস হয় না কেউ সাধ করে বুশকে ভোট দিয়েছিল।'

আমি ভাবলাম ভদ্রলোক কখনও কোনো বুশ সমর্থকের মুখোমুখি নিশ্চয়ই হননি। ফলে বুশের রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনার অবকাশও তাঁর হয়নি। আর এই অনভিজ্ঞতার কারণেই যে Texas থেকে বুশ বিপুল ভোটে জিতেছিলেন তার কোনো আঁচ বা ন্যূনতম ধারণাও তাঁর ছিল না। তাঁর বিশ্লেষণ নিজের রাজনৈতিক অজ্ঞতার ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করেছিল। ঠিক সেরকমই আমাদের দেশেও এই ধরনের লোকের মোটেই অভাব নেই যারা নিজস্ব পরিধির মধ্যে বিশ্বাসের অন্ধতা থেকেই মনে করে সকলেই তার মতো ভাবছে। বাইরের দুনিয়াটা যে অনেক বড় সেখানে যে অনেক অন্যরকমের মানুষ, সেসব খেয়াল তাদের থাকে না। অবশ্যই একজন সাধারণ নাগরিকের একশো ভাগ অধিকার আছে তাঁর নিজস্ব রঙিন চশমায় দুনিয়াটাকে দেখার। সব সময় অন্য চারপাশে কী ঘটে চলেছে মাটিতে কান পেতে বা রাজনৈতিক দুনিয়ার খবরাখবরে মগ্ন থেকে একেবারে টাটকা খবরাখবর নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকার কোনো দায় তাঁর নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মিডিয়া যাদের পেট চলে এই খবরের দুনিয়া ঘেঁটে তাদের যাকে বলে দায় থেকেই যায় এবং পাড়ার বিশু নন্দী কি বলছে (what the man from matungn is saying) তার হাঁড়ির খবর রাখার। অবশ্যই মিডিয়াকে গরিষ্ঠাংশের চিন্তা ভাবনাকেই যে সবসময় খবরে তুলে ধরতে হবে এমনটা নয়। তেমনি নিজস্ব 'প্রতিধ্বনি ঘর' থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে বাইরের পরিস্থিতির ছানবিন করলে আখেরে ভালই হবে। আমাদের ইংরেজি মিডিয়া চ্যানেলগুলির এই মাটির খবর নেওয়ার অনীহাই অযোধ্যা আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কীভাবে গড়পড়তা হিন্দু এককাট্টা হয়েছিল তার কোনো আগাম আন্দাজ তারা তল করতেই পারেনি। কী তীব্র মানসিক অভিঘাত হয়েছিল সমগ্র হিন্দু জনতার ওপর সে ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আর যেটা আমার পছন্দের শুধু সেটাই দেখব আর সেটাই তুলে ধরব এই ধরনের সুবিধাবাদী দৃষ্টিও তাদের সম্পূর্ণ ডুবিয়েছিল ১৯১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়। মোদীকে ঘিরে দেশব্যাপী কী ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল এই তথাকথিত জাতিগত সংস্কার বর্জিত, ভুয়োদর্শী ইংরেজি মিডিয়া তাকে আদৌ শনাক্ত করতে পারেনি।

> ইংরেজি মিডিয়া চ্যানেলগুলির এই মাটির খবর নেওয়ার অনীহাই অযোধ্যা আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কীভাবে গড়পড়তা হিন্দু এককাট্টা হয়েছিল তার কোনো আগাম আন্দাজ তারা তল করতেই পারেনি।

উদারনৈতিক সাংবাদিকরা সেভাবে 'বাস্তবের ভারতকে' ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না এটা অতি সরলীকরণ। কেননা অতীতে এমন অনেকবারই দেখা গেছে এই একই ইংরেজি মিডিয়ার সাংবাদিকরা নিখুঁতভাবে তৃণমূল স্তরের পরিস্থিতি

বিশ্লেষণ করে নির্ভুল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আচ্ছা, যদি এই সাংবাদিকরাই ২০১৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এত সফলভাবে হিসেব করতে পেরেছিলেন তাহলে তার ঠিক আগের বছরে তাঁরা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লেন কেন? উত্তরটা কিন্তু জানা। ভারতের আড়াআড়ি ভাগ বা মেরুকৃত হয়ে যাওয়া ইংরেজি মিডিয়ায় বিশ্বস্ত সংবাদ পরিবেশন ততক্ষণই বিশ্বস্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃণমূল স্তরের খবর মিডিয়ার নিজস্ব পছন্দ ও অপছন্দের অনুযায়ী থাকে। যদি বাস্তবে দেখা যায় খবর পছন্দের বা ভবিষ্যৎ গণনা পছন্দের সেক্ষেত্রে তুমুল বকধার্মিক সেজে এক নীতির ধ্বজাধারী হয়ে খবরটিকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু যদি খবর মিডিয়া কর্তা ও সমমনোভাবাপন্ন সাংবাদিকের পছন্দসই না হয় তাহলেই আসল বাস্তবকে সরিয়ে বাস্তবের উৎপাদন শুরু হয়। সত্যি খবর যত কড়া ও নিষ্ঠুর হবে তত তীব্র হবে তাকে চাপা দেওয়ার প্রক্রিয়া। পাঠক বা দর্শক সেই উৎপাদিত খবরটিই পড়তে বাধ্য হবেন।

হলফ করে বলছি এই জিনিস আমি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি ২০০২ ও ২০০৭ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। তখন যে কেউ গুজরাটের যে কোনো অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেই টের পেতেন যে নরেন্দ্র মোদী প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস তার বিশ্বাসযোগ্য প্রচার যুদ্ধ জারি রাখতেই হাঁপিয়ে উঠছে। কিন্তু হায়! ওই সময়ের ইংরেজি মিডিয়ার পুরনো রেকর্ড দেখুন— তারা বলছে, 'একটি ঝড় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সেই ঝড়ের তীব্রতায় উড়ে যাবেন মোদী ও সঙ্গে তার গেরুয়া ঝাণ্ডা'। এত স্বার্থান্বেষী ও দুরভিসন্ধিমূলক ছিল এই প্রচার যে গণনার দিন যে নানান এন জি ও কর্মী জড়ো হয়েছিল (সকলেই কংগ্রেসের ছদ্মবাহিনী) ফল বেরোনো শুরু হতেই তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তখন বুঝতে পারে তারা শূন্যে প্রাসাদ বানিয়েছিল।

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান দেওয়া নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তা মূলত কিছু অতিবাম ছাত্রদের ক্যাম্পাসের নিরাপত্তায় বিপ্লব বিপ্লব খেলাকে ঘিরে। কিন্তু বাইরে মিডিয়ার দুনিয়ায় বিষয়টা প্রায় গৃহযুদ্ধের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। তা না হলে হঠাৎ করে কেন একদল ইংরেজি মিডিয়ার সাংবাদিক প্রেসের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার বিষয়কে রাজনৈতিক বিতণ্ডার সঙ্গে গুলিয়ে দিয়ে মিছিল বের করে ফেললেন? যে মিছিলে মুদ্রিত ইংরেজি পত্র- পত্রিকার সাংবাদিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিককুল উভয়েই যেন দেশে গৃহযুদ্ধ হচ্ছে এমন একটা প্রতিবাদী ভাব নিয়ে লাফালাফি করতে লাগলেন। এই সরকার বিরোধী আক্রোশের মূল কারণ দু'টি। প্রথমত, সরকার কেন তাদের পাত্তা দিচ্ছে না আর কেনই বা অতীতের নানান পড়ে পাওয়া সুযোগ সুবিধে থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই হুঙ্কার সেই সমস্ত প্রকাশনা সংস্থা ও মিডিয়া চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও ছিল যারা তাদের ধারায় খবর প্রকাশ করার বিষয়ে সহমত হতে পারেনি শুধু নয়, সরাসরি চোখে চোখে রেখে তাদের দাদাগিরির সঙ্গে পাঞ্জা কষেছে। তারা তথাকথিত উদারনৈতিক খবরের ঘেটো থেকে বেরিয়ে গেছে। এই বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যখন দেখা গেল নানান ইংরেজি চ্যানেলে, Times Now-এর অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে ক্ষেপে ওঠে এবং এর কারণ দেখাতে অজস্র মিথ্যে অজুহাত উৎপাদন করলেন তাঁরই পেশাগত সহকর্মীরা। যেহেতু অর্ণবের চ্যানেল বহুল দর্শিত হচ্ছে এবং তাঁরা টি আর পি যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন তখনই তাঁরা নিজেরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেজে নম্র ও বিনয়ের উদার অবতার হয়ে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে গোঁড়া, একপেশে বলে চিহ্নিত করার কু-চেষ্টায় নামলেন। কিন্তু এর কোনোটাই বাজারে কাটবে না। কেননা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অন্তর থেকে কখনই বিশ্বাস করে না যে ভারতে বসে 'ভারত নিপাত যাওয়ার' ধ্বনি দেওয়া লোকজনের কীর্তিকলাপ বালখিল্যের তামাশা হিসেবে লঘুভাবে মেনে নেওয়া উচিত। ইতিমধ্যে মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন উভয় সংবাদমাধ্যমেই সংস্থার সাংবাদিক ও সম্পাদকের মধ্যে বারবার সেই আগে বলা 'প্রতিধ্বনি ঘরে' আবদ্ধ থাকা বা বিরুদ্ধে মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার কামান দাগার নেতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

আমি হতভম্ব হয়ে দেখি কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি কাগজ টেনিসের বৃদ্ধা প্রায় বিস্মৃত খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার একটি Retweet নিয়ে তাদের কাগজের লিড করছে। এটিই আমার মতে হিন্দু ঘটিত রোগের উপসর্গ যার পরিণতিতে এক সমীহ উদ্রেককারী সংবাদপত্র বামপন্থী চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং শেষমেষ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বাজার হারায়। যখন পাঠকের চাহিদাকে খাটো করে নিজেদের ঔদ্ধত্য জাহির করা হয় তখন আদতে সংবাদমাধ্যমেরই ক্ষতি হয়। ভুললে চলবে না এখন অন লাইন প্রকাশনার যুগ চলছে। তাই সাংবাদিকতার মাপকাঠি এখন আরও খবর জোগাড় করা আর পুরনো দিনের মতো যোগাযোগ রাখার ওপর নির্ভরশীল নয়। এখন এই পেশাটি নানান হাতে-গরম মতামত, তার মধ্যে কিছু মুছে ফেলা বা বিলোপ করা যেগুলো পছন্দসই নয় যার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিছক ঔদ্ধত্য বা অপমান করার প্রবণতা। স্মৃতি ইরানির ওপর যে তীব্র উপর্যুপরি নোংরা আক্রমণ নেমে আসছে এটি তারই জ্বাজল্যমান প্রমাণ। কিন্তু দর্শকরা বা সংবাদ পাঠকরা এসবে ভোলবার ভবি নয়, তারা তাদের রিমোর্ট কন্ট্রোল-এ ঠিক জায়গার জন্য ভোট সংরক্ষিত রাখছে।

(লেখক বিশিষ্ট ভাষ্যকার)

এই আঁতাতে নিহত কংগ্রেসীদের আত্মা কি বলে উঠবে না— বিশ্বাসঘাতক, বেইমান!

অমলকান্তি বসু

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাত আজকের নয়। নেহরুকে তোয়াজ করে কমিউনিস্টরা রাশিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের মাটিতে পা রেখেই নেহরু বললেন, 'আমি একজন সমাজবাদী।' এর পরই নেহরুর দাক্ষিণ্যে কমিউনিস্টরা নেহরু সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের মতো জায়গায় কমিউনিস্ট রজনী প্যাটেল কংগ্রেস সভাপতির পদ লাভ করেন। সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি কমিউনিস্টরা দখল করে নেয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে কমিউনিস্ট কুমার মঙ্গলমের দলে প্রস্তাব ও নেতৃত্বে কংগ্রেস দলটিকে দখল করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে বিমান দুর্ঘটনায় কুমার মঙ্গলমের অকাল মৃত্যু ও ১৯৭৪ সালে সঞ্জয় গান্ধীর উত্থানে সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। অবশ্য সেটি না হলেও সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা পুষ্ট জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এডিটোরিয়াল বোর্ড' দখল করে থাকেন কমিউনিস্ট এস. গোপাল, নুরুল হাসান (যিনি পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন), সতীশ চন্দ্র, রোমিলা থাপাররা। এদের কাজ হলো কেন্দ্রের দেওয়া অর্থে মার্কসবাদ প্রচার, দেশে বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণ ও ভোগবিলাসের দেশি বিদেশি উপকরণে উদ্দাম জীবনযাপন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একটু টান মারতেই ভারতবাসীর দৃষ্টি ঘোরাতে আফজল গুরু, ইয়াকুব মেনন, কাশ্মীরের আজাদি ও পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জিহাদি জঙ্গি মুসলমানদের আশীর্বাদ পেতে চাইছে। প্রতি বছর এরা করাচীতে মানবাধিকার সভায় যায় বলে এরা কারও কাছে দেশপ্রেম শিখতে চায় না। তাই এদের দেশপ্রেমের ঝাঁপিটি এবার একটু খোলা প্রয়োজন।

মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করার পর ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল কমিউনিস্টরা ইংরেজ সরকারের কাছে এক গোপন স্মারকলিপি দেয়। সেই অনুসারে ১৯৪২ সালের ১২ মে কমিউনিস্ট পিসি যোশী বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের জি আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের শাখা সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় (R.C. Majumdar–History of Freedom movement, Vol.-3, Page-689)।

সুগত বসু পার্লামেন্টে বলেছেন, 'ভারতবর্ষ এত ভঙ্গুর নয় যে কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্যদের দেশবিরোধী স্লোগানে ভেঙে পড়বে।' ধন্যবাদ সুগতবাবুকে, এদের স্লোগান দেশবিরোধী স্লোগান বলে স্বীকার করার জন্য। রোহিত ভেমুলা নিজে তফশিলভুক্ত না হয়েও তফশিলভুক্ত এবিভিপি নেতা এন সুশীল কুমারকে রাতদুপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বা বিবেকানন্দ সম্পর্কে তার বাণী 'বিবেকানন্দ জাতিপ্রথার পক্ষে ছিলেন, একজন তর্কবাগীশ, নারী বিদ্বেষী এবং নকল বুদ্ধিজীবী। তিনি একজন অহংকারী-অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি যিনি কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধার ধারতেন না এবং যার কোনো সঠিক বা মৌলিক জ্ঞান বা কল্পনাও ছিল না' বলা সত্ত্বেও যেমন ভারতীয় সভ্যতা ভঙ্গুর হয়ে যাবে না। তেমন সুগতবাবুকে আরও মনে করিয়ে দিই যে ভারতের সপ্তম সাধারণতন্ত্র দিবসে খান আবদুল গফুর খান (সীমান্ত গান্ধী) এসেছিলেন দিল্লীতে। তার পর দিন তাঁকে কুরুক্ষেত্রে নিয়ে এসে হিন্দু মা-এরা তাদের মাথার চুল জলে ভিজিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে সামনে দাঁড়ানো তাদের ছেলেদের দেখিয়ে বলে 'আপনি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করুন, যাতে ওরা আপনার মতো মানুষ হয়।' ভারতের এই

সংস্কৃতি আজও প্রবহমান বলেই সুগতবাবু ভঙ্গুরতা নিয়ে যা বলেছেন সেটি একেবারে সঠিক। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশীল মাণ্ডি ও নির্ঝর মুখার্জিদের গলায় স্যানিটারি ন্যাপকিনে দেশদ্রোহী স্লোগান লিখে আন্দোলন বা রেডরোডে যিনি নামাজ পড়ান ঈদের দিনে সেই ফজলুর রহমান যিনি বলেছেন 'আমরা ২৭ শতাংশ। বাংলায় কে সরকার গড়বে তা আমরাই ঠিক করব' এই রণহুঙ্কারের জবাবে সুগতবাবু কি বলতে পারবেন ভারত তথা বাংলা এত ভঙ্গুর নয় বা কারও জমিদারিও নয়?

কলকাতার যাদুঘরে ভবিষ্যতে রক্ষণের জন্য কলকাতার দেওয়ালে কমিউনিস্ট-কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নগুলি (সামনে দোলউৎসব বলে) এক সঙ্গে একই দোলায় চেপে ইতিমধ্যেই দুলতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার স্বাতন্ত্র্যতার একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। সরকারী কাজে প্রধানমন্ত্রী নেহরু কলকাতায় এসে রাজভবনে বাংলার কংগ্রেস সভাপতিকে দেখতে না পেয়ে পুলিশকে বললেন, তাকে ডেকে আনতে। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি তখন বর্ধমানে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ধান ঝাড়ছিলেন। সেই অবস্থাতেই পুলিশের জীপে তিনি এলেন রাজভবনে। নেহরু তাঁকে বললেন, 'আমি কলকাতায় এসেছি, তুমি জান না। উত্তরে সেই কংগ্রেস সভাপতি নেহরুকে বললেন 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু আপনি তো এখন সরকারি কাজে কলকাতায় এসেছেন। যেদিন দলের কাজে আসবেন, অবশ্যই দেখা করব।' (কষ্টকল্পিত— অতুল্য ঘোষ) এই বুকের পাটা আজ বাংলায় কোনো কংগ্রেস নেতারই নেই। বিবাহের পর ভারতের নাগরিকত্ব ১৪ বছর গ্রহণ না করা সোনিয়া মাইনো বা মাত্র ১০ বছর রাজনীতি করা রাহুল গান্ধীর চরণামৃত পান করতে দেখছি ৪০ বছরের অধিক রাজনীতি করা আবদুল মান্নান ও অধীর চৌধুরীদের। মনে পড়ে ভৈরব গাঙ্গুলীর যাত্রাপালা দেবী সুলতানার একটি সংলাপ— 'প্রভুর উচ্ছিষ্ট পেতে শিক্ষা নে ওই সারমেয়টির কাছে। যে উচ্ছিষ্টের লোভে তার প্রভুর মনোরঞ্জনে সর্বদা লেজ নাড়ে।' দলের স্বার্থে এই লেজ নাড়া মেনেও জিজ্ঞাসা করি, মেনে নিচ্ছেন ধানতলার কথা। বরযাত্রী বোঝাই বাস থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে সিপিএম হার্মাদ বাহিনীর সারারাত ধর্ষণের পর সকালে পাড়ার লোকের ছুঁড়ে দেওয়া চাদরে মহিলাদের লজ্জা নিবারণের কথা। ওই একই দলের পশুরা বানতলায় অনিতা দেওয়ানের গোপনাঙ্গে দুই ব্যাটারির টর্চ প্রবেশ করিয়ে তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। মহিলাদের রক্ষায় এগিয়ে আসা গাড়ির চালক অবনী নায়ারের জননেন্দ্রিয় প্রথমে থেঁতলে পরে উপড়ে ফেলে দেয়। যৌনাঙ্গে রক্তক্ষরণ নিয়ে রেণু ঘোষ দিল্লী পালিয়ে যায় আর উমা ঘোষকে কলকাতার এক গোপন স্থানে স্থানান্তরিত করার খবর বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত আর এক সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তকে নিয়ে উমা ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও ব্যর্থ হন ডি ওয়াই এফ আই এবং পুলিশের চাপে। এই সব কথা চেপে রাখা হয়েছিল। 'Vital facts suppressed' শিরোনামে Times of India পত্রিকায় ১২.৬.১৯৯০ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্ট-এর অধিকাংশ পেয়ে যাবেন দৈনিক স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিচিত্রায় ৩০ মে ২০১০ সালের সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর নিবন্ধে।

বৃটিশদের ছিল Divide & Rule। আর সিপিএমের হলো Terrorise & Rule। বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই-ও রেহাই পায়নি। দুবরাজপুরে তাদের কর্মী মঙ্গল বাউরী ছিল সিপিএমের পথের কাঁটা। তাকে সরাতে প্রথমে তার মাথায় টাঙির কোপ মারে। স্ত্রী যমুনা বাউড়ী স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকে বিবস্ত্র করে পাশবিক উল্লাসে মেতে ওঠে। ওদের কন্যার তখন বয়স ছিল ১৪/১৫ বছর। সিপিএমের আর এক পশু তার ছেঁড়া ফ্রকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়। তারপর মঙ্গল বাউড়ির গলায় বাঁশ চেপে স্ত্রী ও কন্যার সামনে তরোয়াল দিয়ে তার গলা কেটে দেয়। মনে পড়ে সিপিআই নেতৃবৃন্দ? না পড়লে দৈনিক স্টেট্‌সম্যানের বিচিত্রায় গণমুক্তি পরিষদের সুনন্দ সান্যালের ২৮.৩.২০১০-এর নিবন্ধটি পড়ে নিন।

কিন্তু সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড? প্রথমে খুন হয় মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই, যথাক্রমে জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি ও ছাত্র পরিষদের সহ-সম্পাদক। সে খুন ঠেকাতে গিয়ে খুন হন জিতেন। আহত হন কংগ্রেস নেতা নবকুমার সাঁই, বৃদ্ধা মাতা, দুই ভাই অজয় ও বিজয়। বোন স্বর্ণলতা (যার স্বামীকে আগেই টাঙির কোপ মারা হয়েছে) যার কোলের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করছে দেখে ছুটে এসে তার প্রাণ বাঁচান। কিন্তু নিহত সন্তানদের রক্তমাখা ভাত মায়ের মুখে তুলে দেওয়া তিনি ঠেকাতে পারেননি। এই সব কাজ যারা করেছিল তারা কারা? একজন শাসক দলের কৃষক নেতা, আর একজন পরবর্তীকালে মন্ত্রী হয়েছিলেন (মুখ্যমন্ত্রীর পরেই যার স্থান) আর একজন নাকি নাম ভাঁড়িয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। এই সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত দেখে নিহত কংগ্রেসীদের আত্মা বর্তমান কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে বলে উঠবে না তো 'বিশ্বাসঘাতক', 'বেইমান'?

৩৪ বছর ধরে যারা রিগিং করে বাংলায় সরকার গড়েছে তাদের মুখে স্বচ্ছ নির্বাচনের ধ্বনি। যাদের ভয়ে আজকের মুখর কবি শঙ্খ ঘোষেরা ছিলেন নির্বাক। বানতলার পৈশাচিক ঘটনায় যাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'এ রকম তো কতই হয়'। তাদের সঙ্গে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে বেইমান কংগ্রেসের আহা কী সুন্দর মিলন! সুন্দরের বর্ণনায় সেই বিখ্যাত উক্তিটি একটু পরিবর্তন করে বলতে ইচ্ছা করে 'বন্যেরা বনে সুন্দর, ভারতবাসী দেশদ্রোহী ক্রোড়ে'। তবে ভয়ের কিছু নেই। অরবিন্দের বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মতো বা জেল-জরিমানা হওয়া নজরুলের পত্রিকার মতো অসংখ্য পত্রিকা ভারতবাসীকে দেবে শক্তি ও সাহস আর তাতেই বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রভক্ত অগণিত যোদ্ধা ভারতবাসী দেশদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করে গড়ে তুলবে মায়া-আজটেক-রোমীয় ব্যাবিলনীয় গ্রীক, মিশরীয় সভ্যতার ফসিলমুক্ত এক নতুন ভারত। ■

শনি শিংগনাপুর মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে বিবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

সুতপা বসাক ভড়

মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় শনি শিংগনাপুর মন্দির চারশো বছরেরও বেশি পুরনো। শনিদেবের এই প্রাচীনতম এবং সব থেকে বড় মন্দিরের খোলা প্রাঙ্গণে বিশাল চবুতরার ওপর শনিদেবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত এবং এতে সর্বক্ষণ তেল ঢালা হতে থাকে, চবুতরার ওপর কেবলমাত্র পুরুষেরাই উঠতে পারেন। গত বছর (২০১৫) নভেম্বর মাসে একজন মহিলা ওই উঁচু চবুতরায় উঠে শনিদেবের পূজা-অর্চনা করে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথাভঙ্গে হতাশ গ্রামবাসীরা মন্দিরের শুদ্ধিকরণ করে। এই ঘটনায় কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদ জানান। শুধু তাই নয়, গত ২৫ জানুয়ারি পুণে থেকে ভূমাতা ব্রিগেড এবং তার মহিলা সদস্যারা জোর করে ওই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে পুলিশ প্রশাসন তাদের বাধা দেয়। ঘটনাটি খুবই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এবং হিন্দুধর্মের কট্টরতার ওপর নির্বিশেষে বৌদ্ধিক আগত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হাজি আলি দরগাতেও মহিলাদের প্রবেশের বিধি-নিষেধ আছে, যদিও এ ব্যাপারে মিডিয়া সাড়াশব্দও করে না।

চারশো বছরেরও বেশি পুরনো মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে বিবাদ চলছে, তা আদালত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বম্বে হাইকোর্টের ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চ এই মামলা সামলাতে কেন্দ্র সরকার, মহারাষ্ট্র সরকার এবং আহমদনগরের জেলা প্রশাসনকেও নোটিশ পাঠিয়েছে। সবার কাছ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর মধ্যস্থতা করে বলেছেন যে, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে কিছু দূর থেকে শনিদেবকে দর্শন করতে পারবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা সহমত হয়েছেন যে মহিলা বা পুরুষ কাউকেই ওই শনি মন্দিরের চবুতরায় যেতে দেওয়া হবে না। সেখানে সর্বক্ষণ তেল চড়ানো হয়ে থাকে, সেজন্য পা পিছলে যাবারও ভয় থাকে। পুণের কাছে বালেবাড়িতে এক প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন যে মহিলা-পুরুষ হবার জন্য কোনো ভেদভাব হবে না। প্রত্যেকের প্রার্থনা করার সমানাধিকার আছে। বৈঠকে উপস্থিত মন্দিরের ট্রাস্টিরা তিরুপতি বালাজী মন্দিরের দর্শন ব্যবস্থার বিষয়ে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মতামতকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিকে, ভূমাতা ব্রিগেডে আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন তৃপ্তি দেশাই। তিনি বলেছেন যদি চবুতরার ওপর কাউকে উঠতে না দেওয়া হয়, তবে প্রতিমার পূজা করার পুরোহিতদের মধ্যে মহিলাদেরও সামিল করতে হবে। এই তৃপ্তি দেশাই ওই মন্দিরের চবুতরাতে মহিলাদের যেতে দেবার কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে ভূমাতা ব্রিগেডের কার্যকর্তাদের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং শ্রীশ্রীরবিশঙ্করের উপস্থিতিতে চবুতরাতে উঠে অন্তিমবার পূজা করার সুযোগ পাওয়া উচিত। অপরদিকে আধ্যাত্মিক গুরু

বলেছেন একথা ঠিক নয় যে আপনি যদি একটু দূর থেকে প্রতিমার দর্শন করেন তবে আপনার ভগবানের কৃপা মিলবে না।

আমরা জানি, আমাদের দেশে মহিলা-পুরুষ উভয়েরই সাংবিধানিক সমানাধিকার আছে। মহিলারা কারুর থেকে কোনো অংশে কম নন, এটি তাদের মানবিক অধিকার; কিন্তু ধর্ম কোনো অধিকার দেয় না, শুধুমাত্র নির্দেশ দেয়— এটি করতে হবে, ওটি করতে হবে— তাহলে ধর্মের থেকে আমরা কেন অধিকার চাইব? মহারাষ্ট্রের শনি শিংগনাপুর মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে ভূমাতা ব্রিগেডের আন্দোলনের প্রসঙ্গে জানতে চাই যে তারা মন্দিরে বা ধর্মস্থলে প্রবেশ করার পরে কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এমন তো নয় যে কিছু দূর থেকে দর্শন করলে আমাদের ভগবান আশীর্বাদ করবেন না বা আমরা কোনো সুখ থেকে বঞ্চিত থেকে যাব। তর্কের খাতিরে বলা যায়, শুধুমাত্র মন্দির কেন, মসজিদ, দরগা, গীর্জা ইত্যাদি ধর্মস্থলেও মহিলাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার ঔচিত্য কতটুকু তার ওপরেও প্রশ্নচিহ্ন লেগে যায়— এ থেকে কোনো তারতম্য হয় না আপনি হিন্দু, মুসলমান, না খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। কারণ বেশিরভাগ ধর্মই পিতৃতান্ত্রিক। সুতরাং মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার তুলে তাদের উন্নয়নের অন্যান্য দিকগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনা ঠিক নয়। তাছাড়া, বারবার হিন্দুদের ধর্মস্থল গুলোকেই কেন নিশানা বানাবে বুদ্ধিজীবীরা? অন্যান্য ধর্মের বিধি-নিষেধের দিকে তারা কেন দৃক্‌পাত করে না? প্রাচীন মন্দির এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক নিয়ম কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। স্বয়ং শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে যে তিন ফুট দূর থেকেই মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে দর্শন এবং প্রার্থনা জানাবে। সব থেকে বড় প্রাচীন শনি মন্দিরকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হলে সেখানে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আসাও কমবে। স্থানীয় লোকজনের উপার্জন কমবে, আর্থিক ক্ষতি হবে ওই অঞ্চলের, বদনাম হবে আমাদের দেশের। এই কি কাম্য ভূমাতা ব্রিগেডের? মহিলাদের জন্য অনেক করণীয় কাজ আছে। পুণের ভূমাতা ব্রিগেডকে জানাই কেবলমাত্র ভগবানের মাথায় তেল ঢাললেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তা কিন্তু নয়। এখন প্রশ্ন, যদি শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকারের হয়, তাহলে বলব সমানাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি প্রাথমিকতা অনুসারে দেখাই কাম্য। যে দেশে এখনও পর্যন্ত লিঙ্গানুপাতে ভারসাম্য নেই, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, আর্থিক স্বাধীনতায় আক্রমণ, সামগ্রিকভাবে মহিলাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে প্রথমে জীবনধারণের মৌলিক অধিকারগুলি প্রযোজ্য করার জন্য আন্দোলন বা ব্যবস্থা করলে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করা হবে; নতুবা কিছু রাজনৈতিক দল এবং বিদেশি শক্তি প্রণোদিত আন্দোলন শুধুমাত্র লোকদেখানো বলেই গণ্য হবে।

ভূমাতা ব্রিগেডের বিক্ষোভ।

প্রথমে জীবনধারণের মৌলিক অধিকারগুলি প্রযোজ্য করার জন্য আন্দোলন বা ব্যবস্থা করলে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করা হবে; নতুবা কিছু রাজনৈতিক দল এবং বিদেশি শক্তি প্রণোদিত আন্দোলন শুধুমাত্র লোকদেখানো বলেই গণ্য হবে।

কেবলমাত্র আমাদের ধর্মের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই ধরনের আক্রমণ বারবার বিভিন্ন সংগঠনগুলি করে থাকে। এর পেছনে মদত থাকে অন্য কারুর। তবুও বলি, যদি প্রার্থনার অধিকারের কথাই বলা হয়— তবে বলব যে আমাদের ধর্মে প্রার্থনা কোনো অধিকার নয়, এটা কেবলমাত্র আত্মনিবেদন; কেড়ে নেওয়ার নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়ার। ■

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তাত্ত্বিক জ্ঞান আর ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এরকমই একজন হরিশ আগরওয়াল। যাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান খুব একটা না থাকলেও ব্যবহারিক জ্ঞানের মাত্রা স্বপ্নাতীত। তিনি অবলীলায় মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সারিয়ে তুলতে পারেন। এমনকী প্রায় অকেজো হয়ে পড়া যে কোনোরকম বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ খুব সহজেই মেরামত করতে পারেন। ৩০ বছর বয়সী হরিশ প্রথম দিকে বিভিন্ন কাজের মধ্যে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে মোবাইল সারানোর কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন তিনি। তবে সে অর্থে কোনো কাজের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। পরে হার্ডওয়ারের কাজকেই নির্দিষ্ট পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ইন্দোরের বাসিন্দা হরিশ আগরওয়াল ২০১১ সালে একটি পোলট্রি ফার্মে কাজ করা শুরু করেন। তার কিছু দিন পর তিনি একটি রেস্তোঁরার ওয়েটার হিসাবে কাজে যোগ দেন। সেখানে প্রতিমাসে ১০-১৫ হাজার টাকা অনায়াসেই উপার্জন করছিলেন। কিন্তু টাকা উপার্জনের ক্ষিদে তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সর্বত্র। তাই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে ইন্দোরের কম্পিউটার হার্ডওয়ার সার্ভিস সেক্টরে জুনিয়র টেকনিশিয়ন হিসাবে যোগদান করেন। সেখানেই মোবাইল সারানোর হাতেখড়ি তাঁর। এর কিছুদিন পর ইন্দিরা নগরের একটি মোবাইলের দোকানে মোবাইল বিক্রির কাজে যোগ দেন। এই ভাবে একের পর এক কাজ ধরছেন এবং ছাড়ছেন যখন, তখনই তাঁর পাশের বাড়ির একজন তার অকেজো ল্যাপটপ সারানোর জন্য তাঁর কাছে আসেন। যে ল্যাপটপটিকে সার্ভিস সেন্টার থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়, সেই ল্যাপটপকেই ঠিক করে দিলেন তিনি।

মেরামতির কাজে ব্যস্ত অ্যাপেল ডাক্তার হরিশ আগরওয়াল।

অ্যাপেল ডাক্তার

বর্তমানে তাঁকে সবাই 'অ্যাপেল ডক্টর' নামে চেনে। অ্যাপল ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে হরিশ আগরওয়াল এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। অ্যাপেল-এর আইফোন বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী যদি একবার খারাপ হয় তা আর মেরামত করা সম্ভব হয় না। কারণ অ্যাপেলের যে কোনোরকম পার্টসের দাম আয়ত্তের বাইরে। তবে হরিশ আগরওয়ালের কাছে সেই ফোন বা ট্যাব এলে অনেক সস্তায় তা সারিয়ে দিতে পারেন। অ্যাপেলের স্টোরে অ্যাপেলের ম্যাকবুক ডিসপ্লের দাম ৩৮ হাজার টাকা। কিন্তু হরিশ তা সারিয়ে দেন মাত্র ২২ হাজার টাকায়। এ প্রসঙ্গে হরিশ জানায়, সিঙ্গাপুর এবং হংকং থেকে যখন এই সমস্ত সামগ্রী আনানো হয় তখন অনেক বেশি পরিমাণে আনালে তা কম দামে পাওয়া যায়। আর তা স্বল্প লাভে খরিদ্দারকে বিক্রি করে থাকি আমরা। তিনি শুধুমাত্র অ্যাপেলের প্রোডাক্টই মেরামত করে থাকেন। বর্তমানে বছরে ৩ কোটি টাকা আয় করেন তিনি। তাঁর অধীনে ১৮ জন ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত। যাঁরা প্রত্যেকেই অ্যাপেল-এর সবই মেরামত করতে সিদ্ধহস্ত। এ প্রসঙ্গে হরিশ জানান, 'আমরা মেরামত করি, আমরা ফোন বা ট্যাব পাল্টানোর পরামর্শ কখনই দিই না। যদি আমরা সারাতে না পারি তাহলে তা পালটে দিই।' বর্তমানে হরিশের ফোন সারাইয়ের কোম্পানি অ্যাপেল সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত। তবে অ্যাপেল-এর সার্ভিস সেন্টার থেকে ফোন সারাইয়ের ওয়ারেন্টি যেখানে তিন মাস দেওয়া হয় সেখানে হরিশের সংস্থা ওয়ারেন্টি দেয় এক বছর। তাই ইন্দোরের অ্যাপেল ব্যবহারকারীদের রক্ষাকর্তা হরিশ আগরওয়াল। বর্তমানে তিনি তাঁর সংস্থা পুনে, মুম্বই, রাজকোট, আমেদাবাদ, গুরগাঁও, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই-য়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আবার প্রশিক্ষণও দেওয়া চলছে এই সমস্ত জায়গার সার্ভিস সেন্টারগুলিতে।

তবে হরিশ আগরওয়ালের চলার পথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। আর্থিক অভাবের জন্য পড়াশোনা খুব একটা করে উঠতে পারেননি। কারণ তাঁর দাদা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর পড়াশোনার খরচ জোগানো সম্ভব হয়নি তাঁর বাবার পক্ষে। অগত্যা কাজের সন্ধানে লেগে পড়েন তিনি।

আজ হরিশ কর্মক্ষেত্রে সফল হলেও সেই অর্থে সফল হয়নি তাঁর দাদা। বর্তমানে সে হরিশের কাছে কর্মরত। দাদার পরামর্শে সি সি এন এ এবং এম সি আই টি পি (Microsoft Certified It Professional) কোর্স করেছিলেন হরিশ। পুঁথিগত বিদ্যায় সফল না হলেও কম্পিউটার জগতে তিনি যে স্নাতকোত্তর তা আজ প্রমাণিত। শূন্য থেকে শুরু করে তিনি আজ সফল অ্যাপেল ডাক্তার।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

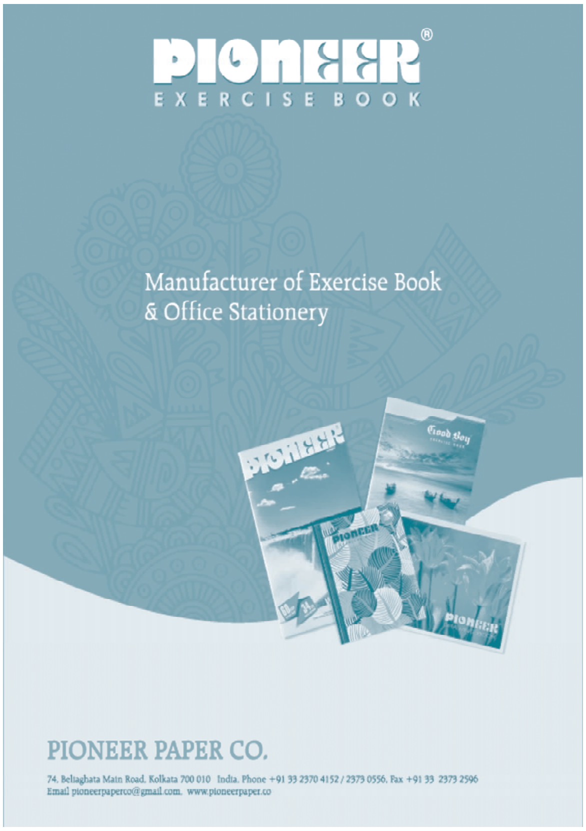

'এটা স্মরণ রাখতে হবে, শিক্ষার প্রকৃত মর্ম তার আদর্শে মধ্যে নিহিত। বিদ্যালয় ও গৃহ উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে। কিন্তু এ দুটির মধ্যে গৃহই হবে প্রধান। বিদ্যালয় থাকবে গৃহের অধীন, গৃহ বিদ্যালয়ের নয়। অতবে বলা যায়, একটি ভারতীয় বালিকার শিক্ষা এভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সে আরও যথার্থভাবে একজন ভারতীয় নারীতে পরিণত হতে পারে।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে মৌলবাদীদের হাতে হিন্দুদের দুর্দশা-চিত্রের একটি সামাজিক দলিল

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

গ্রন্থটির সূচনায় গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটি—'বাংলাদেশে অগ্নিদগ্ধ ও নিষিদ্ধ গল্পগ্রন্থ'। গল্পটি শুধু বাংলাদেশের উগ্রপন্থীদের ক্ষিপ্ত করেছে তাই নয়, এটি পশ্চিমবঙ্গের ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ক্ষিপ্ত করবে। ১৫৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত ১৫টি ছোট ছোট গল্পে লেখক বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুরা কীভাবে মুসলমান মৌলবাদীদের হাতে নির্যাতিত হয়ে দলে দলে দেশত্যাগ করছে তার মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত

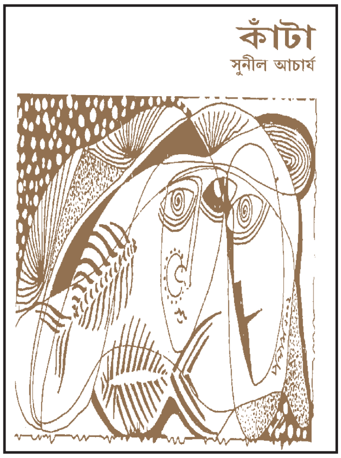

লেখক শ্রী আচার্য তাঁর 'কে উত্তর দেবে' গল্পে লিখেছেন— ভিয়েতনামি, নিগ্রো, প্যালেস্তাইনি রিফিউজিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আর্তনাদ করেন কিন্তু 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পিঞ্জরাবদ্ধ হিন্দুদের কথা উঠলেই আমরা চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে মুখে তালা এঁটে রাখি।' দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারীদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চলছে তার বিরাম নেই। প্রায় সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের দেখলেই 'শালা মালিউন' বলে ঘৃণা উগরে দেয়। হিন্দুদের সম্পত্তি গায়ের জোরে দখল করে তাদের ভিখারিতে পরিণত করে, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ বা নিকা করে হত্যা করে, তাদের মন্দির ধ্বংস করে। প্রশাসন নীরব দর্শক। হিন্দু বলে চাকরি হয় না। ফলে হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশ ত্যাগ করছে। সে দেশ এখন হিন্দুশূন্য প্রায়।

মুসলমান মৌলবাদীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা দলে দলে রাজাকার হচ্ছে। বেশি সংখ্যায় মুসলমানরা মাদ্রাসাতে শিক্ষা নিচ্ছে। লেখকের ভাষায় 'মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় যে শিক্ষা হচ্ছে তাতে টুপি পরা বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে। এতো টুপি পরার প্রবণতা আগে ছিল না। ছিল না মুসলমান বলে নিজেকে জাহির করা' (পৃ. ৯৮)। আগে যে বাড়ির রঙ লাল বা অন্য কিছু ছিল তা এখন সাদা করা হচ্ছে। মৌলবাদীদের লক্ষ্য এখন 'ইন্ডিয়া'কে ইসলামি শাসনের আওতায় আনা এবং সে কাজ তারা অবাধে করে চলেছে।

গোটা গ্রন্থটি বিষণ্ণতায় ভরা। প্রত্যেকটি চরিত্র হতাশ, তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। লেখকের মুনশিয়ানার গুণে পরিবেশও হয়েছে বিষণ্ণ— যা শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। মুসলমানদের অত্যাচারে হতাশাগ্রস্ত দিগম্বরের চিন্তার শেষ নেই। তার চতুর্দিকের পরিবেশও তাই প্রাণহীন। 'কুমার নদের কুলকুল জলের শব্দ বাতাসে ভাসছে। দূরে বাঁশবনে শিয়ালের ডাক। থেকে থেকে রাত জাগা কুকুরের কান্না' (পৃ. ৩৩)। অন্যত্র 'তুলসী মঞ্চে একটা আলোজ্বালা পোকা সাদা আলো জ্বেলে জোনাকির মতো স্থির জ্বলছে' (পৃ. ৩৪)। গোটা গ্রন্থে এমনই চিত্র। গল্পগুলি একেকটি মুক্তা সদৃশ।

মোটকথা গ্রন্থটি সমকালীন বাংলাদেশি মৌলবাদীদের হাতে হিন্দুদের দুর্দশার চিত্র। এটি সাম্প্রতিক সামাজিক দলিলও বটে। লেখক সুনীল বাবুকে ধন্যবাদ এমন নিটোল গল্পগুচ্ছ আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। আমাদের ভাবানোর জন্য। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ পড়ার আশায় রইলাম।

সুনীল আচার্য—কাঁটা।
প্রকাশক : মায়ের ডাক।
৮৫, এপিসি রোড,
কলকাতা-৭০০০০৬।
প্রকাশকাল ২০১৫।
মূল্য : ১৫০ টাকা।

আন্দামানে বীর সাভারকরের প্রয়াণতিথি উদযাপন

সমাবেশ সমাচার

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পোর্ট ব্লেয়ার শাখা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ৫০তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে সেলুলার জেলের জাতীয় সৌধ সংলগ্ন বীর সাভারকর উদ্যানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেলুলার জেলস্থিত সাভারকারের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন ওই উদ্যানের প্রতিটি মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। ভি এইচ পি, এবিভিপি, বিএমএস, পতঞ্জলি, গায়ত্রী কেন্দ্র, আন্দামান বিজেপির নেতৃবৃন্দ, সঙ্ঘের প্রান্তপ্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, চিন্ময় মিশনের স্বামী শুদ্ধানন্দ সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় কার্যকারণী সদস্য তথা পূর্ব বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুভাই কুলকার্ণী সাভারকারের আদর্শ, সংগ্রামী জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ভারত এবং ইংলন্ডে বসবাসকালে তিনি ইন্ডিয়া হাউসের সদস্য ছিলেন। এছাড়া অভিনব ভারত সোসাইটি, ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি-সহ বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা তিনি প্রচার করতেন। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে তিনি 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেনডেন্স' নামক একটি বই লিখেছিলেন যা তৎকালীন বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্ডিয়া হাউসের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা ও বই লেখার অপরাধে ১৯১০ সালে গ্রেপ্তার করে তাঁকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় জাহাজ থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। বিচারে তাঁকে দু'বারের যাবজ্জীবন (৫০ বছর) কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সেলুলার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২১ সালে ছাড়া পান। কারবাসের সময় 'হিন্দুত্ব' ও জাতীয়তাবাদের উপর বই লেখেন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সহ-জেলা কার্যবাহ কে থিয়াগরাজন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গাজোল মনোমোহন শ্রীমতী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন

মালদা জেলার গাজোলে বিদ্যা ভারতীর অনুমোদিত বিদ্যালয় মনোমোহন শ্রীমতী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তীবর্ষ উৎসব গত ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পালিত হলো। এই তিন দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অনুষ্ঠিত হয় শারীরিক কসরৎ, নাটক, হাস্যকৌতুক, গান, নাচ, প্রাক্তন আচার্যাদের বরণ, প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সম্মেলন ইত্যাদি। এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজ স্বামী বৈবস্বতানন্দজী।

কার্যক্রমের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন হাতীমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত ঘোষ, সহ প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত ঘোষ, গাজোলের বিধায়ক সুশীল রায়, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি প্রভাত পোদ্দার, বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, বিদ্যাভারতীর কেশবানন্দ পাল, জগন্নাথ দাস প্রমুখ।

এই উৎসবের আকর্ষণ ছিল সামসী অখিলেশ্বর সরস্বতী শিশু মন্দিরে ও অরবিন্দ সরস্বতী শিশু মন্দিরের দুটি নাচ এবং বাচামারী বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের গম্ভীরা গান। মালদার সৃজা পালের নাচ এবং তাপস চক্রবর্তীর গীটার বাদন, সজল দত্ত, তন্দ্রা পাল ও সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্গীত প্রমুখ জয়া চক্রবর্তীর গান, তবলায় রাজীব দাস ও মালদার অনুপ কুমার চৌধুরীর সহযোগিতা সকলকেই আনন্দ দেয়। রাষ্ট্রবন্দনা বন্দেমাতরম্ গীতের পর রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবের সমাপ্তি হয়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সম্মেলন

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালদহ নগরের অরবিন্দপার্ক সরস্বতী শিশু মন্দিরে। সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। ৩৫০ জন সেবিকা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। 'নারীরা দেশের ভাগ্যবিধাতা' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার। উপস্থিত ছিলেন বন্দনা রায়, তন্দ্রা পাল প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়।

সংস্কার ভারতী-র সোনারপুর শাখার ভরত মুনি স্মরণ জয়ন্তী

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে নতুনপল্লীর (সেন্ট্রাল রোড) নীলিমা ভবনে আয়োজিত হয় 'ভরত মুনি' স্মরণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান। সংস্কার ভারতীর সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সহ-সভাপতি পরিমলেন্দু সরকার সভাপতি এবং অশোক কান্তি বিশ্বাস বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অমিত ঘোষ দস্তিদার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

সভাপতি মহোদয় প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা যুগোপযোগী চতুর্বেদের নির্যাসে এক পঞ্চম বেদ রচনার প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন। এই পঞ্চমবেদ রচনার দায়িত্ব 'ভরত মুনি' প্রাপ্ত হন ব্রহ্মার থেকে যা নাট্যশাস্ত্র নামে পরিচিত। অর্থাৎ 'ভরত মুনি' নাট্যশাস্ত্রের এক এবং অদ্বিতীয় গুরু। বিশিষ্ট অতিথি অশোক কান্তি বিশ্বাস ভরত মুনি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সঞ্চালক শ্রীদস্তিদার নাট্যশাস্ত্র, ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অঙ্কন, নৃত্যের রকমভেদ, দর্শন, শ্রবণ, ভাব, রাগ, রস, তাল ও সপ্তস্বর সম্পর্কে বর্ণনা করেন। গোপাল দাস বাউল বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শান্তি মন্ত্র পাঠ করে সভা সমাপ্তি হয়।

কলকাতায় নারায়ণতলা শাখার বার্ষিক উৎসব

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মহানগরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব বিভাগের লোকনাথ নগরের নারায়ণতলা শাখার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়ে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে আগ্রহ ও উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। নাগরিক সমাজেরও অনেক পুরুষ-মহিলা আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শারীরিক কার্যক্রম, সমবেত গান, সুভাষিতম্, অমৃতবচন সহযোগে প্রায় দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগর প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট। তিনি তাঁর ভাষণে সঙ্ঘ সম্পর্কে অপপ্রচারের বিষয়টি তোলেন। সেই সঙ্গে নাগরিকদেরও অনুরোধ করেন তাঁরা যাতে সঙ্ঘের কাজ খুব কাছ থেকে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেন।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার পরিবার প্রবোধন প্রমুখ রণজিৎ দালাল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রসেনজিৎ দালালের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের হাতে। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক তাপস গড়াই-সহ বহু স্বয়ংসেবক।

***

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বসিরহাট নগর সেবাপ্রমুখ মিঠুন মল্লিকের দাদা সঞ্জয় মল্লিকের বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পিত হয় জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র, জেলা প্রচারক তাপস গড়াই, মহকুমা প্রচারক দীপ্তাশিস দত্তরায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা।

‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২১ ফেব্রুয়ারি সিউড়ী সোনাতোড় পাড়ার ১০৭৫তম পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় তাঁরই ভদ্রাসনে। ‘ওঙ্কার ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। ৮৬ বৎসর বয়সে এখনও কর্মক্ষম। পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সদস্য এবং সক্রিয় কার্যকর্তা। শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানে তিনি শচীনদেব বর্মনের একটি গান পরিবেশন করেন। ব্যাডমিন্টন খেলায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। বহু পুরস্কার লাভ করেছেন সৈনিক জীবনে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁর সামান্যতম অবদান রয়েছে। অবসরকালীন সময়ে সিউড়ী শহরের প্রসিদ্ধ লীজ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পেরে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠান ধন্য হলো।

ঈশ্বরপুরে পরিবার প্রবোধন সভা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ঈশ্বরপুর জেলার কানকি খণ্ডের চৌখরিয়া গ্রামে পরিবার প্রবোধনের এক সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন লক্ষ্মীরানী মল্লিক। গ্রামের পঞ্চাশটি পরিবারের মা-বোনেরা সভায় অংশ নেয়। পরিবারের বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি মায়েদের ভূমিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তিনি স্কুল-কলেজে পড়ুয়া বোনেদের আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির প্রতি অনীহা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণে সমাজ যে আজ বিপথে চালিত হচ্ছে তার মোকাবিলায় মাতৃ সমাজকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ বীরভূম জেলার প্রবীণ কার্যকর্তা তথা ডাক কর্মচারী সঙ্ঘের বীরভূম জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন ঘোষের পিতৃদেব বাউল চন্দ্র ঘোষ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক শরদিন্দু লাহিড়ী (হাবলদা) গত ২ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেচেন। উল্লেখ্য, সঙ্ঘকাজ শুরুর সময় নাগপুর থেকে আগত প্রচারক কালিদাস সালোডকর তাঁর বাড়িতে থাকতেন।

***

বহরমপুর নগরের প্রয়াত স্বয়ংসেবক মণিগোপাল সাহা (খুকুদা)-র ধর্মপত্নী আরতি সাহা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৪ কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

হাওড়া জেলার পাঁচলা খণ্ডের স্বয়ংসেবক অঞ্জন খাঁড়ার বাবা ভক্তিভূষণ খাঁড়া গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ৮ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি হাওড়া জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতশিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের শতবার্ষিকী স্মৃতিতর্পণ

যেসব শিল্পীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল সার্থক স্মৃতিতর্পণ। ছবি : শুভঙ্কর মুখার্জী।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির পৃষ্ঠভূমি কলকাতায় সংস্কৃতি চর্চার যেমন খামতি নেই তেমনি ঘাটতি নেই বিস্মরণেও। সম্প্রতি সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা যারা কখনই শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক নয় তাঁদেরই উদ্যোগে কিছুটা বিস্মৃত প্রতিভাধর সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের শতবার্ষিকী স্মৃতিতর্পণ সন্ধ্যা উদযাপিত হলো রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল গৌরীকেদারের অনুরাগীতে। কথাটি হয়ত সঠিক নয়, কেননা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়ত তাঁর গানের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয়। অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব এখানেই। প্রয়াত শিল্পী ও তাঁর কাজকে বোঝাতে সংস্থা ও শিল্পীর সংস্কৃতিবান পরিবারের উত্তরসূরীরা এক নক্ষত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এদিন— নাট্য ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত থেকে বিভাস চক্রবর্তী। প্রস্তাবনায় যশস্বী শিল্পী ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শ্রীকান্ত আচার্য, গৌরীকেদারবাবুর কর্মভূমি আকাশবাণীর প্রাক্তনী পার্থ ঘোষ থেকে অনুপস্থিত থাকা অসুস্থ সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাপত্র পাঠ সব মিলিয়ে এই সন্ধ্যা সব দিক থেকেই হয়ে উঠেছিল আনন্দময় ও প্রাঞ্জল। পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের ওপর পড়েছিল তাঁর প্রভাব।

রুদ্রপ্রসাদবাবু ও বিভাসবাবু তাঁদের স্মৃতিতে শিল্পীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের আন্তরিকতার উল্লেখ করেন। উঠে আসে শিল্পীর সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের দৌহিত্রীর বিবাহের প্রসঙ্গটিও।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিরভিমান ব্যবহার, শিল্পীর যে বিনয় ও সরলতার কথা বেতার সতীর্থ পার্থবাবু উল্লেখ করেছিলেন তা বারবার মনে করিয়েছে। অনুষ্ঠানে সংস্কারভারতীর নবীন শিল্পীরা যে হারানো গানগুলির চর্চা চালু রেখেছেন তার প্রশংসা করতেই হবে। সেদিনের অনুষ্ঠানের গুণীজন অনেকেই বাংলা সঙ্গীতে আজ মেলডীর অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ তোলেন। গৌরীবাবু যখন গান গাইছেন তখন বাস্তব অর্থে সেই চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে মেলডীর রাজারা সব মধ্য গগনে। ছিলেন রবীন মজুমদার, সত্য চৌধুরী, জগন্ময় মিত্র, ফিরোজা বেগম। সায়গল প্রচুর বাংলা গেয়েছেন। এই প্রতিভাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়েই সফলতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালের গৃহী সন্ন্যাসী। খ্যাতির মধ্য গগনে হেলায় ছেড়ে দিলেন রোমান্টিক গানের গৃহী সন্ন্যাসী। খ্যাতির মধ্য গগনে হেলায় ছেড়ে দিলেন রোমান্টিক গানের যশ প্রতিষ্ঠা। এদিনের অনুষ্ঠানে শ্রীকান্ত আচার্যের— 'আমি তো তোমারে ভুলি নাই' এক অনবদ্য গান পরিবেশনা। যেমনটি ছিল বহুমুখী শিল্পীর গাওয়া কাওয়ালীতে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই গৌরীকেদার চর্চা চালু থাকুক, জানুক নবীন প্রজন্ম। ▌

শব্দরূপ-৭৮১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

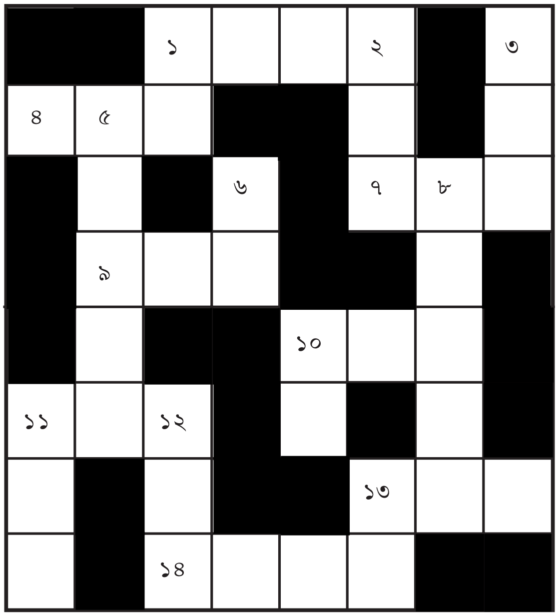

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ক্রীতদাসীপুত্র, **৪.** অলক্ষণা; দুর্ভাগ্যকর, **৭.** মজা, কৌতুক, **৯.** রামচন্দ্রের বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা, **১০.** যোগশাস্ত্রের বিধি অনুসারে নিমেষপাত না করিয়া সূক্ষ্মবস্তুতে দৃষ্টিনিবন্ধ রাখার সাধনা, **১১.** বহুভোগ্যা, বারাঙ্গনা, **১৩.** পাপনাশক, **১৪.** সংস্কৃত পদ্যের ছন্দ, সমগ্র মেঘূত এই এক ছন্দেই রচিত।

উপর-নীচ : **১.** বিহারের অন্তর্গত তীর্থস্থান, যেখানে পিণ্ড দেয়, **২.** পৌরাণিক রাজাবিশেষ, ভগীরথের প্রপিতামহ, **৩.** পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন, কশ্যপ-বিণতার পুত্র, **৫.** 'আগুনের — ছোঁয়াও প্রাণে' **৬.** গোহত্যাকারী, **৮.** পুরাণে এই দুই শাপভ্রষ্ট ভ্রাতার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের কথা আছে, **১০.** শঙ্কা, ভয়, **১১.** মালদহ অঞ্চলের গাজনের উৎসব, **১২.** কচ্ছপ, **১৩.** জলে ভিজানো বাসী ভাত।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৮

		ব	ড়	গ	লা		দো
জা	ব	র			দা		হা
	জ্র				বি	ব	র
দ	শ	হ	রা			দ্ধ	
	লা			শি	শু	পা	ল
মা	কা	ল				গ	
রু		কু			ম	ল	য়
তি		চ	ন্দ্র	বো	ড়		

সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৮১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ মার্চ ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৯

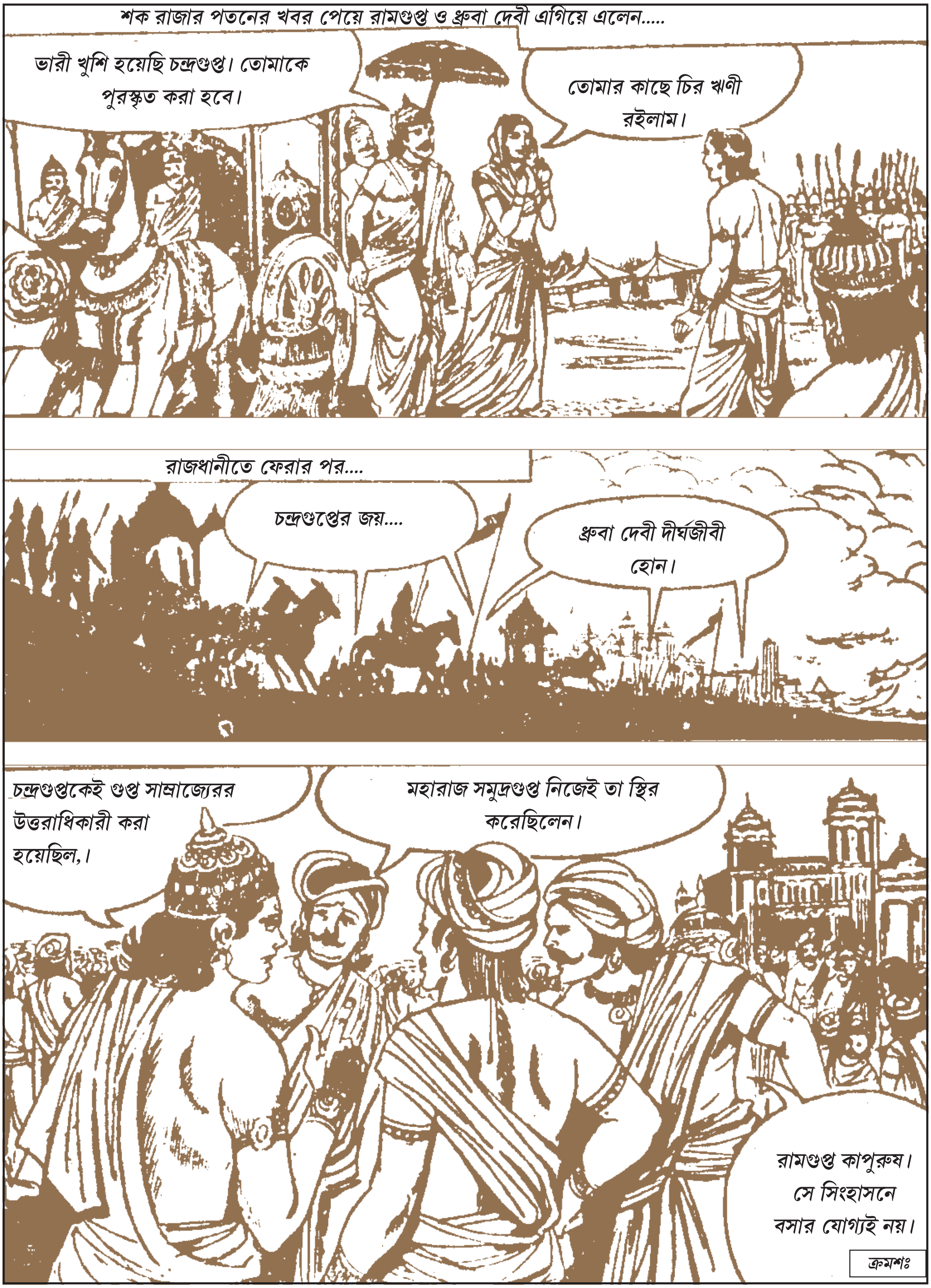

With Best Compliments from -

A Well Wisher

B.M.

झारखण्ड सरकार

बदलता झारखण्ड
विकास की ओर उन्मुख झारखण्ड...

For the first time ATR of last budget was tabled in the Assembly

Economists, Youth, Women, Farmers & Industralists welcome the Budget...

झारखण्ड बजट 2016-17

Promises Fulfilled...

I Want to change the established norms in politics. Expectations of intellectuals, farmers, women and youth have laid the foundation of this budget and we tabled the pro-people budget. Besides agricultural and rural development, this budget is aimed for overall development of the state.

Raghubar Das
Chief Minister, Jharkhand

First time in budget

Baba Saheb Ambedkar Awas Yojna
To mark the 150th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Housing policy will start in rural areas.

Primitive Tribe Development Authority will be constituted
Development schemes for primitive tribes will be executed through this authority.

Primitive Tribe Security Package
This Special health package will be for primitive tribes. It will help them for free check up and treatment.

Bharat and Jharkhand Darshan
Govt. will make arrangements for people from BPL families to visit various tourist and religious sites of Jharkhand and India.

Pension for AIDS patients
Rs. 600 will be given as pension to HIV positive and AIDS patients.

Mukhyamantri Dash Board
To monitor the developmental schemes from state headquarter to blocks, a dash Board will be established.

Old Age Homes in Sahebganj- Jamtara
The state government will setup Old Age Homes for the first time.

Our Commitments	Implementation
Plans will be made at Panchayat level. System will be transparent.	With programmes like'Yojna Banao Abhiyaan' Govt. reached the grass root level and the suggestions gathered from the masses laid the foundation of the budget. Third party audit for public expenditure to be initiated.
Agriculture will lay the foundation of development.	The annual budget for agriculture dept. has been increased by Rs 1200 crore for the financial Year 2016-17. More than 30,000 farmers will be skilled for fruit & vegetable farming through micro-drip irrigation.
Women empowerment is Government's priority.	Gender budget for women, hostels for working women, Rajya Widhwa Samman Pension Yojna, 33% reservation for women in police recruitment. Along with these, many welfare schemes have been put forth.
Job oriented education, creating New Opportunities.	Every assembly constituency to have a college by 2022. Innovative learning, digital library, free wi-fi and training of 5000 youths through national skill development programme will be initiated. Along with this proposal of smart classes in technical and non technical colleges.
Health services for all is in priority. Tourism sector will be focused	With comprehensive health insurance coverage Rs. 2 lakh will be available for identified people for secondary and tertiary medical care . In the sector of tourism many initiatives have been taken. In Maluti renovation of heritage temples are going on.
All Facilities for investors. Infrastructure sector will be strengthened.	For industrial development Rs. 375 crores have been marked in the current budget. In infrastructure sector construction of almost 1000 Km. roads and 25 long bridges are proposed.

connect with CM http://cmjharkhand.in/

Issued by Information & Public Relations Department, Govt. of Jharkhand in public interest